

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর

অধ্যাপক ড. খালেদ হোসাইন

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম

অধ্যাপক ড. হিমেল বরকত

অধ্যাপক ড. মো. মেহেদী হাসান

ড. মো. জফির উদ্দিন

ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া

ড. প্রকাশ দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২০

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলো আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিসরী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতুহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

২০০৭ সাল থেকে সহপাঠ্যপুস্তক হিসেবে আনন্দপাঠ প্রচলিত। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমূর্চী ও যুগোপযোগী করার জন্য ২০২১ সালে সপ্তম শ্রেণির আনন্দপাঠ নতুন করে সংকলিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভালো লাগা, আনন্দলাভ ও জ্ঞানার্জনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। সংকলনে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলিপ্ত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের কাহিনি। একই সাথে ভাষাগত সাবলীলাতা রক্ষা করারও চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি ফ্রেঞ্চে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্রান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দশীল হয়ে উঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিষ্কৃতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলগুলি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব গ্রন্তিমূলক করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের স্বার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তোতা-কাহিনি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১-৫
জিদ	জসীমউদ্দীন	৬-১০
খুদে গোয়েন্দার অভিযান	শহীদ সাবের	১১-১৬
দীক্ষা	মোহাম্মদ নাসির আলৈ	১৭-২৪
পদ্য লেখার জোরে	মাহমুদুল হক	২৫-৩১
কোকিল	হাস ত্রিশিয়ান আন্দেরসেন অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু	৩২-৩৯
কিৎ লিয়ার	উইলিয়াম শেক্সপিয়র বৃপ্তান্ত : জাহানারা ইমাম	৪০-৪৭
যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্র	আবুল কাসিম ফেরদৌসি বৃপ্তান্ত : মমতাজউদ্দীন আহমদ	৪৮-৫৭
নাটিকা		
জাগো সুন্দর	কাজী নজরুল ইসলাম	৫৮-৬৫

তোতা-কাহিনি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



১.

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, কিন্তু জানিত না কায়দা-কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, ‘এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।’

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘পাখিটাকে শিক্ষা দাও।’

২.

রাজাৰ ভাগিনাদেৱ উপৰ ভাৱ পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবাৰ।

পণ্ডিতেৱা বসিয়া অনেক বিচাৰ কৰিলেন। প্ৰশ্নটা এই, উক্ত জীবেৱ অবিদ্যাৰ কাৰণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে, সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধৰে না। তাই সকলেৰ আগে দৱকাৰ, ভালো কৰিয়া খাচা বানাইয়া দেওয়া। রাজপণ্ডিতেৱা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩.

স্যাকৰা বসিল সোনাৰ খাচা বানাইতে। খাচাটা হইল এমন আশৰ্য যে, দেখিবাৰ জন্য দেশবিদেশেৱ লোক ঝুঁকিয়া পড়ি। কেহ বলে, ‘শিক্ষাৰ একেবাৱে হৃদমুদ্দ।’ কেহ বলে, ‘শিক্ষা যদি নাও হয়, খাচা তো হইল। পাখিৰ কী কপাল।’

স্যাকৰা থলি বোৰাই কৰিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়িৰ দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, ‘অঞ্জ পুরির কর্ম নয়।’

ভাগিনা তখন পুরিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুরির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, ‘সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না।’

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটুনি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে বাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, ‘উন্নতি হইতেছে।’

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪.

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, ‘খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।’

কখাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘ভাগিনা, এ কী কথা ওনি!'

ভাগিনা বলিল, ‘মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ভাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ভাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।’
জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫.

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল ব্যং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি ব্যং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘট্টা ঢাক ঢেল কাড়া নাকাড়া তুরি ভেরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগত্পৎ। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিত্র মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধরনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, ‘মহারাজ কাঙ্টা দেখিতেছেন!'

মহারাজ বলিলেন, ‘আশ্চর্য। শব্দ কর নয়।'

ভাগিনা বলিল, ‘ওধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কর নাই।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল বোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বশিয়া উঠিল, ‘মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি।’

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, ‘ওই যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।’

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, ‘পাখিটাকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।’

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ক্ষতি নাই। খাঁচায় দালা নাই, পানি নাই; কেবল

রাশি রাশি পুথি হইতে রাশি রাশি পাতা হিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোঝা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবাবে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিম্নকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬.

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দন্তের মতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঁধিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা বাটপট করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, ‘এ কী বেয়াদবি।’

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্মুখীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আকেশ নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।’

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাও করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের প্রসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদান চড়িল এবং কোতোয়ালের হাঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭.

পাখিটা মরিল। কোনকালে যে কেউ তার ঠাহর করিতে পারে নাই। নিম্নক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, ‘পাখি মরিয়াছে।’ ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, ‘ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।’

ভাগিনা বলিল, ‘মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পূরা হইয়াছে।’

রাজা শুধাইলেন, ‘ও কি আর সাফায়।’

ভাগিনা বলিল, ‘আরে রাম।’

‘আর কি শুড়ে।’

‘না।’

‘আর কি গান গায়।’

‘না।’

‘দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।’

‘না।’

রাজা বলিলেন, ‘একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।’

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।

রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হাঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুথির শুকনো পাতা খসখস গজগজ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাতুয়ার কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্চাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে (৭ই মে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকের ঠাকুরপুরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহার্থি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদাসুন্দরী দেবী। বাল্যকালেই তাঁর কবিতাবিভাব উন্মোচন ঘটে। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, গীতিকার, সুরকার, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা। কবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গান অর্থাৎ সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাই তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ। তাঁর অজন্ম রচনার মধ্যে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিরা', 'কল্পনা', 'বলাকা', 'পুনশ্চ', 'চোখের বাণি', 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'শেষের কবিতা', 'বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'গল্পগুচ্ছ', 'বিচ্ছি প্রবন্ধ', 'কালাস্তুর' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (৭ই আগস্ট ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ) আশি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

একবার 'মৃথ' তোতা পাখির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন রাজা। রাজার ভাগিনাদের ওপর দেওয়া হলো সেই শিক্ষার ভাব। ডাকা হলো রাজপঞ্জিদের। নানা আলোচনা শেষে তারা সিঙ্কল্প জানালেন, সামান্য ঝড়কুটো দিয়ে পাখিটি যে-বাসা বাঁধে, সে-বাসা অধিক বিদ্যাধারণের উপযুক্ত নয়। তাই রাজপঞ্জিদের পরামর্শ অনুযায়ী পাখির জন্য নির্মিত হলো সোনার খাচা। অপূর্ব সে খাচা দেখার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকে পড়ল। এরপর পঞ্জিত মশাই এলেন পাখিকে বিদ্যা শেখাতে। পুথি-লেখকরা পুঁথির নকল করে করে বিশাল স্তুপ তৈরি করল। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি চলল খাচাটার মেরামত ও মেরামতের তদারকি। পাখির শিক্ষা-কার্যক্রম ঘটকে দেখতে চাইলেন রাজা। পত্র-মিত্র-অমাত্য নিয়ে রাজা শিক্ষাশালায় উপস্থিত হলেন। অমনি বেজে উঠল নানা বাদ্যযন্ত্র। রাজার শিক্ষাশালায় আসার মূল উদ্দেশ্যই ঢাকা পড়ে গেল রাজাকে স্বাগত জানাবার এমন হলুচুল আয়োজনে। এদিকে, শিক্ষার চাপে পাখিটি ধীরে ধীরে আধমরা হয়ে এল। একদিন দেখা গেল, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়ে খাচার শিক কাটবার চেষ্টা করছে। পাখির এ 'বেয়াদবি' দেখে কিংবুকে কোতোয়াল ডেকে আনল কামারকে। এবার পাখির জন্য তৈরি হলো শিকল, কাটা পড়ল ডানা। পঞ্জিতেরাও এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি নিয়ে শিক্ষা দিতে উদ্যত হলো। অবশ্যে পাখিটা মারা গেল।

শিক্ষার স্বাভাবিক পথকে ঝুঁক করে বাড়াবাড়ি রকমের আয়োজন ও জবরদস্তিটাই তোতা-কাহিনিতে করুণরূপে ফুটে উঠেছে। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপশিক্ষার প্রতিফলকে পাখির মৃত্যুর রূপকে তুলে ধরেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|---------|---------------------------|
| শত্রু | — বিশেষ বিদ্যা বা গ্রন্থ। |
| অবিদ্যা | — অজ্ঞতা। |
| দক্ষিণ | — পারিশ্রমিক, প্রণামী। |
| স্যাকরা | — অর্পকার। |

হন্দমুদ্দ	— চেষ্টার শেষ পর্যন্ত, যতদূর সম্ভব।
নস্য	— তামাকের গুঁড়া।
তলব	— ডাকা।
পুথি	— পুস্তক, হাতে লেখা বই।
নকশ	— অনুলিপি।
পর্বতপ্রমাণ	— পাহাড়ের সমান।
পারিতোষিক	— পূরক্ষার, পারিশ্রমিক।
খবরদারি	— তত্ত্বাবধান করা।
পালিশ	— চকচকে করা।
তনখা	— টাকা, মুদ্রা।
খুড়তুতো	— চাচাতো, কাকাতো।
মাসতুতো	— মাসি বা খালার সন্তান।
কোঠা	— বালাখানা-গাকা ঘর, প্রাসাদ।
নিন্দক	— নিন্দা করে যে, গঞ্জে সত্যবাদী অর্থে।
তদারক	— তত্ত্বাবধান, খবরদারি।
ময়ঃ	— নিজ।
অমাত্য	— মন্ত্রী।
ভুরি	— বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, রূপশিঙ্গা, বিউগল।
ভেরি	— বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঢাক।
দেউড়ি	— সদর দরজা।
জগঝংস্য	— জয়তাক, প্রাচীন রূপবাদ্য বিশেষ।
তদারকনবিশ	— তত্ত্বাবধানকারী।
তদ্র-দন্তুর মতো	— শিষ্ট প্রথা অনুযায়ী।
রোমাধঃ	— শিহরণ।
সড়কি	— বর্ণা, বক্তৃম।
কোতোয়াল	— গ্রহণী, নগর-রক্ষক।
হাপর	— চুম্বিতে বাতাস দেওয়ার জন্য নলযান্তু থলি।
ঠাহর	— টের পাওয়া, অনুভব করা।
কিশলয়	— গাছের কচি পাতা, লতুন পাতা।
মুকুলিত	— যা আধফুটঙ্গ বা যা কুঁড়িতে পরিপন্থ হয়েছে।

জিদ

জসীমউদ্দীন



এক তাঁতি আর তার বউ। তারা বড়েই গরিব। কোনোদিন খায়, কোনোদিন খাইতে পায় না। তাঁত খুঁটি চালাইয়া, কাপড় বুনাইয়া, কীই-বা তাহাদের আয়?

আগেকার দিনে তাহারা বেশি উপার্জন করিত। তাহাদের হাতের একখানা শাড়ি পাইবার জন্য কত বাদশাজাদিয়া, কত নবাবজাদিয়া তাহাদের উঠানে গড়াগড়ি পাঢ়িত।

তখন একখানা শাড়ি বুননে মাসের পর মাস লাগিত। কোনো কোনো শাড়ি বুনন করতে বৎসরেরও বেশি সময় ব্যয় হইত।

সেইসব শাড়ি বুনাইতে কতই-না যত্ন লইতে হইত। রাত থাকিতে উঠিয়া তাঁতির বউ চুরকা লইয়া ঘড়ুর-ঘড়ুর করিয়া সূতা কাটিত। খুব ধরিয়া ধরিয়া চোখে নজর আসে না, এমনই সরু করিয়া সে সূতা কাটিত। তোরবেলায় আলো-আধারির মধ্যে সূতা-কাটা শেখ করিতে হইত। সুর্ঘের আলো যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, তখন সূতা কাটিলে সূতা তেমন মূলাম হইত না।

তাঁতি আবার সেই সুতায় নানা রকমের রৎ মাখাইত। এত সরু সুতা আঙুল দিয়া ধরিলে ছিড়িয়া যায়। তাই বাঁশের সঙ্গে শলার সঙ্গে আটকাইয়া, সেই সুতা তাঁতে পরাইয়া, কত রকমের নকশা করিয়া তাঁতি কাপড় বুনাইত। সেই শাড়ির উপর বুনট করা থাকিত কত রাজকন্যার মুখের রঙিন হাসি, কত ঝপকথার কাহিনি, কত বেহেশতের আরামবাগের কেচছা। ঘরে ঘরে মেরেরা সেই শাড়ি পরিয়া যখন হাঁটিত, তখন সেই শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে কত প্রল-এ-বকওয়ালি আর কত লুবানকন্যার কাহিনি ছড়াইয়া পড়িত।

শাড়িগুলির নামহই-বা হিল কত সুন্দর। কলমি ফুল, গোলাপ ফুল, মন-খুশি, রাসমণি, মধুমালা, কাজললতা, বালুচর। শাড়িগুলির নাম ওনিয়াই কান জুড়াইয়া যায়। কিন্তু কীসে কী হইয়া গেল! দেশের রাজা গেল। রাজ্য গেল। দেশবাসী গথের ভিথারি সাজিল। বিদেশি বণিক আসিয়া শহরে কাপড়ের কল বসাইল। কলের ধোয়ার উপর সোয়ার হইয়া হজার হজার কাপড় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল; বেমন সন্তা তেমনই টেকসই। আবার যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। তাঁতির কাপড় কে আর কিনিতে চায়!

হাট হইতে নকশি-শাড়ি ফিরাইয়া আনিয়া তাঁতিরা কাঁদে। শূন্য হাঁড়িতে চাউল না-গাইয়া তাঁতির বউ কাঁদে। ধীরে ধীরে তারা সেই মিহিন শাড়ি বুনন ভুলিয়া গেল। এখনকার লোক নকশা চায় না। তারা চায় টেকসই আর সন্তা কাপড়। তাই তাঁতি মিলের তৈরি মোটা সুতার কাপড় বুনায়। সেই সুতা আবার যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। চোরাবাজার হইতে বেশি দামে কিনিতে হয়। এখন কাপড় বেচিয়া যাহা লাভ হয়, তাহাতে কোনোরকমে শুধু বাঁচিয়া থাকাই যায়। এটা-ওটা কিনিয়া মনের ইচ্ছামতো খাওয়া যায় না।

কিন্তু তাঁতির বউ সে কথা কিছুতেই বুবিতে পারে না। সে তাঁতিকে বলে, ‘তোমার হাতে পড়িয়া আমি একদিনও ভালোমতো খাইতে পারিলাম না। এত করিয়া তোমাকে বলি, হটে যাও। ভালোমতো একটা মাছ কিনিয়া আনো। সে কথা কানেই তোলো না।’

তাঁতি উত্তর করে, ‘এই সামনের হাটে যাইয়া তোমার জন্য ভালোমতো একটা মাছ কিনিয়া আনিব।’ সে হাট যায়, পরের হাট যায়, আরও এক হাট যায়, তাঁতি কিন্তু মাছ কিনিয়া আনে না।

সেদিন তাঁতির বউ তাঁতিকে ভালো করিয়াই ধরিল, ‘এ হাটে যদি মাছ কিনিয়া না-আনিবে তবে রহিল পড়িয়া তোমার চৱকা, রহিল পড়িয়া তোমার নাটাই, আমি আর নলি কাটিব না। রহিল পড়িয়া তোমার শলা, আমি আর তেনা কাড়াইব না। শুধু শাকভাত আর শাকভাত, খাইতে পেটে চৱ পড়িয়া গেল। তাও যদি পেট ভরিয়া খাইতে পাইতাম।’

তাঁতি কী আর করে? একটা ঘৰাপঘসা ছিল, তাই লইয়া তাঁতি হাটে গেল। এ-দোকান ও-দোকান ঘুরিয়া অনেক দৱ-দষ্টৱ করিয়া সেই ঘৰাপঘসাটা দিয়া তাঁতি তিনটি ছোট মাছ কিনিয়া আনিল।

মাছ দেখিয়া তাঁতির বউ কী খুশি! আহাদে আটখানা হইয়া সে মাছ কুটিতে বসিল। এভাবে ঘুরাইয়া কত গুমর করিয়াই সে মাছ কুটিল। যেন সত্য সত্যই একটা বড়ো মাছ কুটিতেছে। তারপর পরিগাটি করিয়া সেই মাছ রাখা করিয়া তাঁতিকে খাইতে ডাকিল।

তাঁতি আর তার বউ খাইতে বসিল। তিনটি মাছ। কে দুইটি খাইবে, আর কে একটি খাইবে— কিছুতেই তারা ঠিক করিতে পারে না। তাঁতি বউকে বলে, ‘দেখ, রোদে ঘামিয়া, কত দূরের পথ হাঁটিয়া এই মাছ কিনিয়া আনিয়াছি। আমি দুইটি মাছ খাই। তুমি একটা খাও।’

বউ বলে, ‘উহু। তাহা হইবে না। এতদিন বঙ্গিয়া কহিয়া কত মান-অভিমান করিয়া তোমাকে দিয়া মাছ কিনাইয়া আনিলাম। আমিই দুইটি মাছ খাইব।’ তাঁতি বলে, ‘তাহা কিছুতেই হইবে না।’ কথায় কথায় আরও কথা ওঠে! তর্ক বাড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে রাতও বাড়ে, কিন্তু কিছুতেই মীমাংসা হয় না, কে দুইটি মাছ খাইবে আর কে একটি মাছ খাইবে! অনেক বাদানুবাদ, অনেক কথা কাটাকাটি, রাতও অর্ধেক হইল। তখন দুইজনে ছির করিল, তাহারা চুপ করিয়া শুমাইয়া থাকিবে। যে আগে কথা বলিবে, সে-ই একটা মাছ খাইবে।

তাঁতি এদিকে মুখ করিয়া, তাঁতির বউ ওদিকে মুখ করিয়া শুইয়া রহিল। থালাভোরা ভাত-তরকারি পড়িয়া রহিল। রাত কাটিয়া ভোর হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই। ভোর কাটিয়া দুপুর হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই।

দুপুর কাটিয়া সন্ধ্যা হইল, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নাই। বেলা যখন পড়-পড়, আকাশের কিনারায় সাঁওয়ের কলসি ভৱ-ভৱ, পাড়ার লোকেরা বঙ্গাবলি করে, ‘আরে ভাই! আজ তাঁতি আর তাঁতির বউকে দেখিতেছি না কেন? তাদের বাড়িতে তাঁতের খটর-খটরও শুনি না, চরকার ঘড়ুর-ঘড়ুরও শুনি না। কোনো অসুখ-বিসুখ করিল নাকি? আহ্য! তাঁতি বড়ো ভালো মানুষটি। বেচারা গরিব হইলে কী হয়, কারো কোনো ক্ষতি করে নাই কোনোদিন।’

একজন বলিল, ‘চলো ভাই! দেখিয়া আসি ওদের কোনো অসুখ-বিসুখ করিল নাকি।’

পাড়ার লোকেরা তাঁতির দরজায় আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নাই। ভিতর হইতে দরজা বুক।

তখন তারা দরজা ভাঙিয়া ঘরে চুকিয়া দেখিল, তাঁতি আর তাঁতির বউ শুইয়া আছে। নড়ে না, ঢেঢ়ে না—ডাকিলেও সাড়া দেয় না। তারপর গায়ের মোল্লা আসিয়া পরীক্ষা করিয়া ছির করিল, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।

আহ্য কী ভালোবাসা রে! তাঁতি মরিয়াছে, তাহার শোকে তাঁতিবউও মরিয়া গিয়াছে। এমন মরা খুব কমই দেখা যায়। এসো ভাই আতর-গোলাপ মাখাইয়া কাফন পরাইয়া এদের একই কবরে দাফন করি।

গোরত্নন সেখান হইতে এক মাইল দূরে। এই অবেলায় কে সেখানে যাইবে? পাড়ার দুইজন ইমানদার লোক মরা কাঁধে করিয়া লইয়া থাইতে রাজি হইল। মোল্লা সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কবর দেওয়ার সময় জানাজা পড়িতে হইবে। গোরত্ননে মুরদা আনিয়া নামানো হইল; মোল্লা সাহেব একটি খুঁটির সঙ্গে তাঁর ঘোড়াটা বাঁধিয়া সম্মত তদারক করিতে লাগিলেন।

তাঁর নির্দেশমতো কবর খোঁড়া হইল। তাঁতি আর তাঁতির বউকে গোসল করাইয়া, কাফন পরাইয়া সেই কবরের মধ্যে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তখনও তাহারা কথা বলে না। তাহাদের বুকের ওপর বাঁশ চাপাইয়া দেওয়া হইল। তখনও তাহারা কথা বলে না। তারপর যখন সেই বাঁশের ওপর কোদাল কোদাল মাটি ফেলানো হইতে লাগিল, তখন বাঁশ-খুঁটি সমেত তাঁতি লাখাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘তুই দুইটা খা, আমি একটা খাব।’

সঙ্গে ছিল দুইজন লোক আর মোল্লা সাহেব। তারা ভাবিল, নিশ্চয়ই ওরা ভূত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গের দুইজন লোক মনে করিল, তাঁতি যে তার বউকে দুইটা খাইতে বলিল, নিশ্চয়ই সে তাহাদের দুইজনকে খাইতে বলিল। তখন তাহারা ঝুড়ি কোদাল ফেলিয়া দে-দৌড়, যে যত আগে গারে! মোল্লা সাহেব মনে করিলেন, তাঁতি নিজেই আমাকে খাইতে আসিতেছে। তখন তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘোড়ার পিঠে সোয়ার হইয়া মারিলেন চাবুক। ভয়ের চোটে ঝুঁটি হইতে ঘোড়ার দড়ি খুলিয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন।

চাবুক খাইয়া ঘোড়া ঝুঁটি উপড়াইয়া দিল ছুট। ঘোড়া যত চলে সেই দড়িতে বাঁধা ঝুঁটা আসিয়া মোল্লা সাহেবের পিঠে তত লাগে। তিনি ভাবেন, বুঝি ভূত আসিয়া তাঁর পিঠে দাঁত ঘষিতেছে। তখন তিনি আরও জোরে জোরে ঘোড়ার গায়ে চাবুক মারেন, আর দড়ি সমেত ঝুঁটা আসিয়া আরও জোরে জোরে তাঁর পিঠে লাগে।

হাসিতে হাসিতে তাঁতি আর তাঁতির বউ বাড়ি আসিয়া ভাত খাইতে বসিল।

লেখক-পরিচিতি

জসীমউদ্দীনের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাঙ্গুলখানা থামে। পাঞ্জিকাৰি হিসেবে তিনি বিশেষভাবে স্ব্যাত। জসীমউদ্দীনের কবিতায় আমবাংলার রূপ ও সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে সহজ-সরল ভাষা আৱ সাবলীল ছন্দে। 'নক্ষী-কাথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'রাখালী', 'ধানঘেত' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, ভ্রমণ-কাহিনি, স্মৃতিকথা, নাটক, গীত ও প্রবন্ধের বইও রচনা করেছেন। শিশুদের জন্য লিখেছেন 'ডালিম কুমার' নামে একটি অসাধারণ বই। সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য জসীমউদ্দীন বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা পান। তিনি একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকেও ভূষিত হন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

এক তাঁতি আৱ তাঁতিবউ তাঁত চালিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস কৰে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ দেশে কাপড়েৰ কল আসলে তাঁতিদেৱ কাপড় আৱ কেউ কিনতে চাইল না। কলে তাঁতি পৱিবাৰ বড়ো অভাৱে পড়ল। এত অভাৱে যে, তারা ভালো কৰে খেতেও পায় না। বউয়েৰ আবদারে বাধ্য হয়ে অভাৱেৰ সংসাৱে তাঁতি হাট থেকে তিনটি ছেটো আকারেৰ মাছ কিনে আনল, সখ কৰে তাঁতিবউ তা রাখা কৱল। দুজনে থেতে বসলে তাদেৱ মধ্যে কথা উঠল কে দুটি থাবে, কেই-বা একটি থাবে। পৱে মীমাংসা হলো তারা চুপ কৰে থাকবে, যে আগে কথা বলবে সে-ই একটা থাবে। এমন জেদ ধৰল দুজনে যে, কেউ কথা আৱ বলে না। মৱে যাওয়াৰ জোগাড় হলো তাদেৱ, পাড়া-প্ৰতিবেশীৰা মনে কৱল দুজন বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তাদেৱ গোৱাঙানে নিম্নে ধাওঁঘা হলো, কৰৱ খুঁড়ে গোৱ দেওয়া হচ্ছে এমন সময় তাঁতি 'তুই দুইটা থা, আমি একটা থা'ব' বলে লাক দিয়ে উঠল। যারা গোৱ দিতে গিয়েছিল, মুৰদা কথা বলছে দেখে তারা ভাবল, এৱা ভূত হয়ে গেছে; তাই সবাই দৌড়ে পালাল। পৱে তাঁতি ও তাঁতিবউ বাড়িতে ফিরে ভাত থেতে বসল।

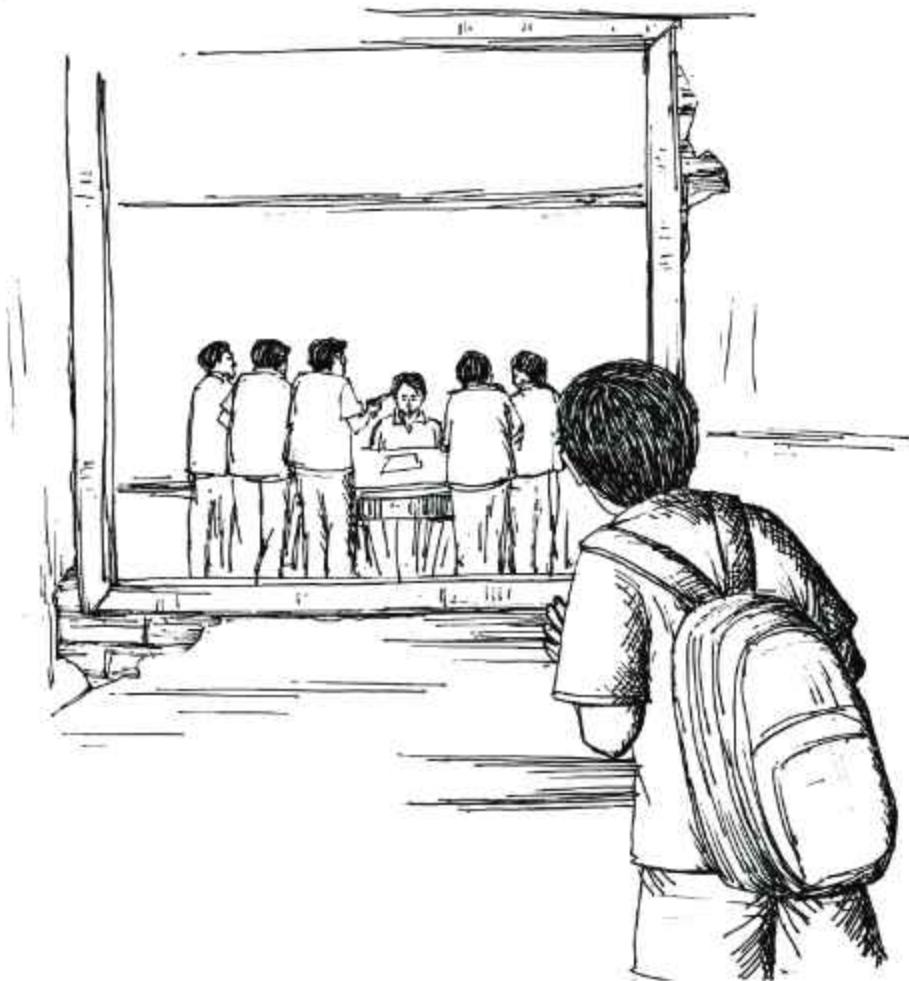
অনাবশ্যক জেদ যে মানুষেৰ জীবনকে জাটিল কৰে তোলে এবং অন্যকেও সমস্যায় ফেলে দেয়, গল্পটিতে এই সত্য প্ৰকাশিত হয়েছে।

ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ ଟିକା

ଜିଦ	— ଏକଗୁଡ଼ୀମି, ନାହୋଡ଼ ଭାବ ।
ଚରକା	— ସୁତାକାଟାର ସ୍ଵର ।
ମୁଲାମ	— ମୋଲାଯେମ, ନରମ ।
ଗୁଲ-ଏ-ବକ୍ଷ୍ୟାଳି	— ବାକ୍ଷ୍ୟାଳି ଫୁଲ । ଏହି ନାମେ ଏକ ପରି ଛିଲେନ । ଏଥାନେ ତାର କାହିଁନିର କଥାଇ ବଲା ହେଯେଛେ ।
ବଣିକ	— ସ୍ୟବସାୟୀ ।
ସୋଯାର	— ଆରୋହଣ କରା ।
ଟେକସଇ	— ମଜବୂତ ।
ନାଟାଇ	— ସେ ଚରକି ବା ଶଳାକାଶ ସୁତା ଜଡ଼ାନେ ହେ ।
ଶଳା	— କାଟି ।
ନଳି	— ସୁତା ଜଡ଼ାବାର ଛୋଟୋ ନଳ ।
ତେଲା	— କାପଡ଼େର ଟୁକରା ।
ଘସାପୟସା	— ଫୁଲେ ସାଓଯା ପରସା ।
ଅଛୁଦେ ଆଟଖାନା	— ଭୀଷଣ ଶୁଶ୍ରି ହେଯା ।
ଗୁମର	— ଗର୍ବ, ଦେମାକ, ଅହମିକା ।
ବାଦାନୁବାଦ	— ତର୍କ-ବିତର୍କ ।
ପରିପାଟି	— ସାଜାନୋ-ଗୋହାନୋ ।
ମୀମାଂସା	— ବିବାଦ ବା ସମ୍ବ୍ୟାର ସମାଧାନ ।
ମୁରଦା	— ମୃତଦେହ ।

খুদে গোয়েন্দার অভিযান

শহীদ সাবের



স্কুল থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল, ছোট একটি গলির ভেতর দিয়ে আসছিল খোকা, অঙ্ককার হয়ে এসেছে, গলির ভেতরটাতে আরো অঙ্ককার, এদিকটায় গ্যাসবাতি জ্বলে, আর সেই গ্যাসের আবহা আলোয় পথ চিনে যেতে বেশ অসুবিধে।

গলির মাঝামাঝি এসেই হঠাৎ কী একটা শব্দ এল তার কানে, থমকে দাঁড়ায় খোকা। এক মিনিট মাত্র, তারপরই একটা অস্তর চিন্তায় বুকটা তার ধড়াস করে উঠল, ভয়ে ইঁটু দুটো কাঁপছে তার। সে ভাবতে লাগল, কী করবে? কী তার করা উচিত? ইত্তত করতে লাগল খোকা।

কিন্তু বেশিক্ষণ এই অবস্থা রইল না। ধীরে ধীরে মনে সাহস ফিরিয়ে আনল সে। তার মনে হলো— এই মুহূর্তে সে যেন একটা বিরাট কর্তব্য করতে যাচ্ছে। অসীম সাহসে বুক বেঁধে সে গা টিগে টিগে এগোলো।

পাশেই একটা পুরোনো একতলা বাড়ি। বাড়িখানার প্রায় ভেঙে-গড়া দশা। তা হলেও খোকা বেশ বুঝতে পারল শুরু ভেতরে লোক থাকে। একটু ভেতরের দিকের একটা কামরাতে টিমটিমে বাতি জ্বলছে— তারই একটুখানি আলো এসে পড়েছে রাঙ্গার ওপর। খোকা গা টিগে টিগে সেই আলো লক্ষ করে এগোলো।

খুব সন্তর্পণে পা ফেলে খোকা এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। জানালাটা বৰ্ক। কিন্তু কাঠের ফাঁক দিয়ে চোখ রাখলে ঘরের ভেতরটা বেশ দেখা যায়। একবার দৃষ্টি দিয়েই শুকিয়ে উঠল খোকার অঙ্গরাত্মা।

দেখল ঘরের ভেতর একপাশে একটা ভাঙা লঠন জ্বলছে। আবহা আলোয় দশ-বারো জন লোক বসে আছে। তাদের সবাইকে ভালো করে দেখা যায় না। তবু যা দেখল তাতেই খোকার থাণ যায় যায়।

একটা লোক হতভবের মতো ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে আছে আর একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে সামনে, একজনের হাতে রিভলবার।

বাকি লোকগুলো ওকে ঘিরে রয়েছে।

চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটা বলছে, ‘না, ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।’

রিভলবারধারী কঠিন দৃঢ়কষ্টে বলল, ‘করতেই হবে তোমাকে। নইলে দেখতেই তো পাচ্ছ—।’

রিভলবারটা একবার নাড়ল সে।

‘একটুও শব্দ হবে না, একেবারে আধুনিক যন্ত্র, সামান্য একটু হিস। তারপরেই বাস।’

কিন্তু লোকটার কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না, মনের বল তারও কম নয়।

নিরুত্তর বসে রাইল লোকটা।

তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে অঙ্গরাত্মা আবার বলল, ‘শোনো তেওয়ারি, আধুনিক সময় দিলাম তোমাকে। এর মধ্যে মনস্তির করো। এই রাইল কাগজ-কলম। শুধু একটা সই, নইলে আধুনিক পরে আত্মারাম আর খাঁচায় থাকবে না।’

হঠাতে ফিরে এলো খোকার।

আর মাত্র আধুনিক। আর মাত্র আধুনিক। তার পরেই একটা প্রাণ ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। খোকার মনের মধ্যে খেলে গেল হঠাতে আলোর ঝলকানি। না, আর এখানে নয়, খোকা ভাবল। ত্রুটে মেরে এল সে জানালা থেকে।

পা টিপে টিপে গলি থেকে বেরিয়ে খোকা দিল এক দৌড়। এক দৌড়ে এসে পড়ল রাস্তার মোড়ে।

বগলে বই চেপে সে ভাবতে লাগল, কী করবে এখন। কোথায় যাবে? খোকার মনে হলো যেমন করেই হোক লোকটাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? স্কুলে থার্ড ক্লাসের ছাত্র সে। বয়স্ক লোক যদি হতো, বন্ধুবাক্স জুটিয়ে সে নিজেই উক্তার করত লোকটিকে।

বড়ো রাস্তায় অনেক আলো। ভয় তার কেটে গেল অনেকটা। ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল সাহস।

হ্যাঁ, সাহস করে এগোতে হবে তাকে। এমন একটা কর্তব্য তাকে করতে হবে যা কতদিন ধরে সে কল্পনা করে এসেছে।

চট করে তার মনে পড়ে গেল তার প্রিয় বইয়ের অতি গরিচিত মানুষগুলোর কথা। সত্যেন ঘোষ। ডিটেকটিভ সত্যেন ঘোষ হওয়ার এটাই সুযোগ।

কিন্তু খোকা ভাবল সত্যেন ঘোষ তো বয়স্ক বুড়ো শোক। সে বরং তার সাগরেদ তরঙ্গ সুস্রত হতে পারে। ঠিক। সে হলো সুস্রত। শক্তিমান, বলিষ্ঠ নিভীক সুস্রত। কোনো চালাকি তার কাছে থাটে না। প্রত্যেকটা খুনি তার কাছে ধরা পড়ে। যারা পড়ে না তারা অসাধারণ। কিন্তু খোকাকে এবারে সে দুষ্সাহসিক কাজের বিবরণ পড়াই নয়,

এবার হাতে-কলমে এগোতে হবে। এতদিন সে বীরেৱ কীৰ্তিকলাপেৰ কাহিনি পড়েই এসেছে, এবার সে নিজেই বীৱ হবে।

কিন্তু এখন কী কৰা যায়? মাথায় তাৰ বুদ্ধিও আসছে না। দীনেন রায়েৱ ত্ৰেক ঘদি এই অবস্থায় পড়তেন, তা হলৈ কৰ্তব্য ঠিক কৰতে তাৰ এক মুহূৰ্তও দেৱি হতো না। অথচ সময় খুব কম। না, আৱ দেৱি কৰা চলে না। মাত্ৰ আধুনিক সময়, তাৰ মধ্যে আবাৰ পাঁচ মিনিট ইতোমধ্যেই কেটে গেছে।

তাই তো! লোকটাকে বাঁচাতে হবে যে! সেই আবশ্যিক কাটবাৰ আগেই আচমকা হানা দিয়ে লোকটাকে বাঁচাতে হবে মৃত্যুৰ কৰ্বল থেকে। সে ভাৰতে লাগল সত্যেন ঘোষ এৱকম অবস্থায় গড়লৈ কী কৰতেন। ভাৰতে ভাৰতে তাৰ মনে হলো এমন অবস্থায় তাৰ কৰ্তব্য হচ্ছে একজন ইন্সপেক্টোৱ সঙ্গে কৱে সৱাসিৱ ঘৱে গিয়ে হানা দেওয়া। ঠিক।

কিন্তু ইন্সপেক্টোৱ কোথাৱ থাকেন, তাৰ যে তাৰ জ্ঞান নেই।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটা লোক। খোকা ভাৰল, সমস্ত ব্যাপারটা একে খুলে বলাটা কেমন হবে?

বিপদ আছে তাতে। এসব আনাড়ি লোক হয়ত চেঁচামেচি কৱে সব মাটি কৱে দেবে। টেৱে পোয়ে পাখি ততক্ষণে উড়েই থাবে।

তবে হ্যাঁ, ইন্সপেক্টোৱেৰ বৌজটা ওৱ কাছ থেকে নেওয়া যেতে পাৱে। চট কৱে বুদ্ধি থেলে গেল তাৰ মাথায়। লোকটাৱ সামনে গিয়ে সে খুব বুদ্ধিমানেৰ মতো জিজেস কৰল, ‘আচ্ছা এখন কয়টা বাজে বলতে পাৱেন?’ লোকটা একটু অবাক হলৈন। তাৱপৰ হেসে বললেন, ‘সাতটা।’

খোকা একটু ভাৰল।

‘আচ্ছা, পুলিশেৰ ইন্সপেক্টোৱ কোথাৱ থাকেন বলতে পাৱেন?’

‘কেন খোকা! পুলিশেৰ ইন্সপেক্টোৱ দিয়ে কী কৱবে?’

লোকটাৱ কথায় খোকাৰ রাগ হয় খুব।

খোকা ভাৱে, লোকটা পোয়েছে কী তাকে, কত বড়ো একটা কাজ কৰতে বেৰিয়েছে সে। যদি সফল হয় তা হলৈ কালকেৱ প্ৰভাতী সংবাদপত্ৰগুলোতে বড়ো বড়ো অক্ষৱে তাৰ কীৰ্তিকথা প্ৰচাৱ কৱা হবে।

লোকটাৱ কথার জবাবে খোকা বললে, ‘আমাৰ দৱকাৱ। কোনো ইন্সপেক্টোৱেৰ ঠিকানা জ্ঞান থাকলে দয়া কৱে বলুন।’

অদ্বুলোক একটুখনি চুপ কৱে থেকে তাকে বললেন, ‘কেন, তুমি থানায় গেলে তো পাৱো।’

কথাটা মনে ধৰল তাৰ। থানায় রাণুলা হলো খোকা।

লোকেৰ কাছে জিজেস কৱতে কৱতে থানাৰ পথ চিনে সোজা সে হাজিৱ হলো থানাৰ অফিসঘৰে। সামনেই বাসে ছিলেন ওসি।

দেখলেন বেশ একটা অল্পবয়স্ক ছেলে কী যেন বলবে মনে কৱে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি তাকে জিজেস কৱলেন, ‘কী খোকা, কী দৱকাৱ তোমাৰ?’

আবাৰ খোকা! মনে মনে বেজায় চটে গেল সে। কিন্তু মুখে শুধু বললে, ‘অনেকগুলো লোক মিলে একটা লোককে খুন কৱছে।’

ওসিৰ কাজই হলো অপৰাধ বেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। কাজেই তিনি একেবাৱে লাফিয়ে উঠলেন।

‘কোথায়? কেমন কৱে? তুমি কী কৱে জানলে?’

খোকা তাকে আদ্যোপাস্ত ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে ওসি মাথা নেড়ে বললেন, ‘তাই তো।’

খোকার তখন সাহস আরো বেড়ে গেল।

সে বলল, ‘শিগগির চলুন। এতক্ষণে হয়ত লোকটাকে ওরা মেরেই ফেলেছে।’

ওসি তখন জনাদশেক কনস্টেবল নিয়ে একটা জিপে গিয়ে উঠলেন।

জিপ গাড়িটা ছুটে চলেছে। খোকার তখন কী আরাম। সামনে ছাইভারের পাশে বসেছে খোকা। দূর দূর কাগছে তার বুক। কত বড়ে একটা অভিযানে চলেছে সে। তার মনে হয় ওদের জিপটা যদি অন্য একটা জিপকে অনুসরণ করত তাহলে বেশ হতো। শাই শাই করে বেরিয়ে যেত এক-একটা গাড়ি। অবশেষে অপরাধীর গাড়িটা ধরে ফেলত তারা।

সেই গলির মোড়টা এসে পড়তেই খোকা বলল, ‘থামুন, এইখানে।’

হড়মুড় করে নেমে পড়ল সবাই।

খোকা বলল, ‘সাবধানে গাঁটিপে টিপে আসুন, নইলে— ফুড়ুৎ।’

খুব সন্তর্পণে এগিয়ে সেই একতলা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল তারা। ভেতরে তখনও আলো জ্বলছে। আর ঘর থেকে ভেসে আসছে তুমুল হাসির সাড়া। জনালার কাছে এসে খোকা উঁকি মারল।

ওসিকে ফিসফিস করে বললো, ‘ওই ওরা।’ ওসি এদিক-ওদিক তাকিয়ে, দুয়ারে আঘাত দিল। ভেতর থেকে তেসে এল কর্কশ কঠর, ‘কে?’

‘দুয়ার খোল।’

দুয়ারটা পরক্ষণেই খুলে গেল। একটা লোক বেরিয়ে এসে জিজেস করল, ‘কী চান?’

খোকা দেখেই তাকে চিনতে পারল। সেই রিভলবারধারী।

‘আরে এ যে দেখছি মমতাজ সাহেব।’ ওসি হঠাত বলে উঠলেন, ‘কী ব্যাপার?’

মমতাজ সাহেবে বললেন, ‘আমিও তো বলি কী ব্যাপার। আপনি যে হঠাত! তা আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।’

মমতাজ সাহেবের পিছু পিছু সকলে ঘরে ঢুকল। ওসি সারাটা ঘর একবার ভালো করে দেখে নিলোন। তারপর চেয়ারের ওপর পড়ে থাকা কাগজপত্রগুলো দেখতে দেখতে হঠাত সশব্দে হেসে উঠলেন।

মমতাজ সাহেব ও তার সঙ্গীরা সকলেই তখন দাঁক্কণ হকচকিয়ে গেছেন। একসঙ্গে এত পুলিশ, দারোগা দেখে সকলের চোখ ছানাবড়া।

ওসির হাসি দেখে তারা ঘাবড়ে গেল আরো। ওসি তাদের ভয় ভাঙানোর জন্য বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না।

অসময়ে হানা দিয়ে আপনাদের কাজের ব্যাপার করলাম বলে। ব্যাপার কিছুই নয়। আমরা সবাই এসেছিপাম একটা অনুরোধ নিয়ে। আমরা যেন বাদ না পড়ি।’

মমতাজ সাহেব হেসে বললেন, ‘নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।’

তারপর কিছুক্ষণ খোশগাল্প করে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আসার সময় খোকাকে শক্ত হাতের মুঠোয় চেপে ধরতে ভুললেন না ওসি।

বাইরে এসে খোকাকে তিনি জিজেস করলেন, ‘মোহন কখনো পড়েছ বল দিকি?’

খোকা বুঝতেই পারল না ওসি কী বলছেন।

এ আবার কেমন রহস্য, সে ভাবল।

'ମାଥାଟା ତୋ ଗୁଲେ ଥେବେଛ । ତୋମାଦେର ନିଯେ ସେ କି ହବେ, ତାଇ ଆମି ଭେବେ ପାଇ ନା ।' ପରେ ଖୋକାକେ ବାଡ଼ିତେ ପୌଛେ ଦିଯେ ଏଲେନ ଓସି ।

ପରାଦିନ ସଂବାଦପତ୍ରେ ବଡ଼ୋ ବଡ଼ୋ ଅକ୍ଷରେ ନିଚେର ଘଟନାଟି ବେଙ୍ଗଳ :

ଗତ ୧୫ଇ ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜାମିତ୍ର ରୋଡ଼େର ବାଡ଼ିତେ ଆଇଟାଇ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଚ ସଥନ ତୀହାଦେର ନୃତ୍ୟ ନାଟକରେ ମହଡା ଦିତେଛିଲେନ ତଥନ ଫରାକ୍‌କାବାଦେର ଓସିର ନେତୃତ୍ୱେ ଏକଦଳ ପୁଲିଶ ତଥାୟ ଗିଯା ହାନୀ ଦେଇ । ଘଟନାର ବିବରଣେ ପ୍ରକାଶ, ସୈଫୁଦ୍ଦୀନ ଓରଫେ ଖୋକାବାରୁ ନାମେ ଏକ ବାଲକ ଥାନ ପୁଲିଶକେ ଥବର ଦେଇ ସେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମିଳେ ଅପର ଏକଟି ଲୋକକେ ଖୁଲୁ କରିତେ ଯାଇତେହେ । ତାହାରା ସେଇ ଲୋକଟିକେ କୋନୋ ଏକଟି ଦଲିଲେ ସାଫ୍ର କରିବାର ଆଦେଶଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୟ ଦିଯାଇଛେ, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟେ ଉକ୍ତ ଦଲିଲେ ସାଫ୍ର ନା-କରିଲେ ତାହାକେ ରିଭଲବାର ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରିବାର ହୃଦ୍ୟକ ଦେଓୟା ହେଇଯାଇଛେ । ବାଲକରେ ନିକଟ ହାଇତେ ଏହି ମର୍ମେ ସଂବାଦ ପାଇୟା ଫରାକ୍‌କାବାଦେର ପୁଲିଶ ତଥାୟ ହାନୀ ଦେଇ । ଆରୋ ଜାନା ଗିଯାଇଛେ ସେ, ଥାନାର ଓସି ତଥାୟ ଗିଯା ଆଇଟାଇ ସଂଘର ପ୍ରକ୍ଷ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ମମତାଜୁନ୍ଦିନ ସାହେବକେ ଦେଖିତେ ପାଇ । ଘରେ ମଧ୍ୟେ ଟୋଲ, ତବଳା, ପୋଶାକ ଏବଂ ଏକଟି ନାଟକେର ପାଞ୍ଚଲିପିଓ ତିନି ଦେଖିତେ ପାଇ, ପାଞ୍ଚଲିପିର କରେକ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇୟା ତିନି ସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାରଟି ବୁବିତେ ପାରେନ । କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ପୂର୍ବେ ବାଲକଟି ସଥନ ସେଇ ପଥ ଦିଯା ଅତିକ୍ରମ କରିତେଇଲୁ, ତଥନ ନାଟକେର ମହଡା ଚଲିତେଇଲ, ବାଲକଟିକେ ଓସି ବାଡ଼ି ପୌଛାଇୟା ଦେଇ । ଜିଜ୍ଞାସାବାଦେର ମଧ୍ୟ ଦିଯା ତାହାର ନିକଟ ହାଇତେ ଜାନା ଯାଇ ସେ, ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା କାହିନି ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧିଯି । ମୋଟ ୧୮୦ ଥାନା ମୋହନ ସିରିଜ, ୧୮୯ ଥାନା ସେକ୍ରଟନ ବ୍ରେକ, ସବକଟି କନାନ ଡେରେ, ନୀହାରଙ୍ଗଣ, ପାଚକଡ଼ି ଦେର ସବଥାନା ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାହାତ୍ମ୍ବ ଦେ ଇତୋମଧ୍ୟେଇ ଶେଷ କରିଯାଇଛେ । ଛେଲୋଟି ଆଗାଥା କ୍ରିସ୍ଟିର ନାମ ଶୁଣିଯାଇଛେ, ତବେ ଇଂରେଜି ଜାନା ନା ଥାକାଯ ଏଥନ୍ ଶୁଣି କରିତେ ପାରେ ନାହିଁ ।

ଲେଖକ-ପରିଚିତି

ଶହୀଦ ସାବେର ୧୯୩୦ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ କାନ୍ଦାଜାର ଜେଲାର ଦ୍ୱାଦ୍ୟୀଓ ହାମେ ଜନ୍ମପଥଙ୍କ କରେନ । ତାର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଏ କେ ଏମ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ । ତିନି କିଶୋର ବୟବେ ଥେକେ ସାହିତ୍ୟରଚଳନ ଶୁଣ କରେନ । ତାର ପ୍ରକାଶିତ ରଚନାମୂହ ହଲୋ— 'ଆରୋକ ଦୁନିଆ ଥେକେ'; ଛେଟୋଦେର ଗଲ୍ଲ-ସଂକଳନ 'କୁଦେ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାର ଅଭିଯାନ'; ଗଲ୍ଲ-ସଂକଳନ 'ଏକ ଟୁକରୋ ମେଘ' । ତିନି ଅନୁବାଦ କରେହେନ କରେକଟି ବିଦେଶି ଗଲ୍ଲ ଓ ଜୀବନୀହାତ୍ । ୧୯୭୧ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେର ୩୧ଶେ ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତରେ ବେଳା ତାର କର୍ମତ୍ତ୍ଵର 'ସଂବାଦ' ଅଫିସଟି ପାକିଜାନି ହାନାଦାର ବାହିନୀ ପୁଢ଼ିଯେ ଦିଲେ ତିନି ଅଣ୍ଣିଦନ୍ତ ହୟେ ଶହିଦ ହନ ।

ପାଠ-ପରିଚିତି ଓ ମୂଳଭାବ

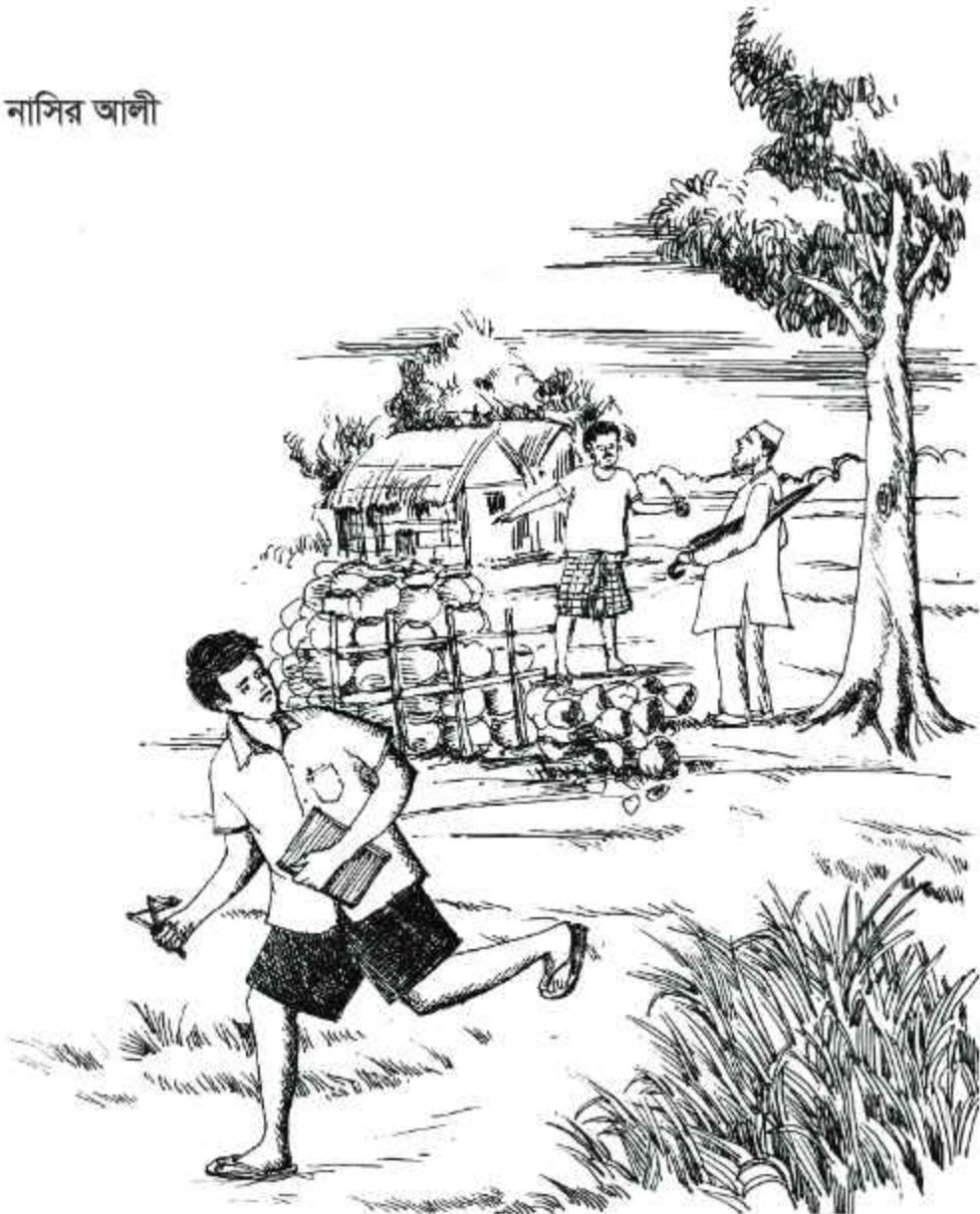
ସୈଫୁଦ୍ଦୀନ ଓରଫେ ଖୋକା କୁଲେର ଧାର୍ଡ କ୍ଲ୍ଯୁସେର ଛାତ୍ର । ପ୍ରଚୁର ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା-କାହିନି ପଡ଼େ ଫେଲେଛେ ସେ । ଏକଦିନ କୁଲ ଥେକେ ଦେରି କରେ ହେବାର ସମୟ ଏକଟି ପୁରୋନୋ ବାଡ଼ିତେ ରହସ୍ୟଜଳକ ଘଟନାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଦେ । ଦେଖେ କାଯେକଜଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳେ ଏକଜଳକେ ଦଲିଲେ ସାଫ୍ର କରିତେ ବଲଛେ; ସାଫ୍ର ନା କରିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟେ ତାକେ ଖୁଲୁ କରା ହବେ । ଲୋକଟିକେ ବାଚାବାର ଜଳ୍ୟ ଖୋକା ଦ୍ୱାରା ଥାନାର ଗିଯେ ପୁଲିଶେ ଥବର ଦେଇ । ଥାନାର ଓସି କାଯେକଜଳ ପୁଲିଶ ନିଯେ ଛୁଟେ ଯାଇ ଦେ ବାଡ଼ିତେ । ଦେଖା ଯାଇ— ମେଥାନେ ଏକଟି ପରିଚିତ ନାଟ୍ୟଦଲେର ନୃତ୍ୟ ଏକ ନାଟକେର ମହଡା ଚଲଛେ । କିନ୍ତୁ ମେଟି ଯେ ନାଟକେର ମହଡା— ଖୋକା ତା ବୁଝାଇଛେ ପାରେନି । ତାଇ ମେ ମହଡାର ଏକଟି ଦୃଶ୍ୟ ତାର ଆଗେଇ ପଡ଼ା ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା-କାହିନିର ରହସ୍ୟର ମିଳ ଥୁବେ ପାଇ । ନିଜେକେବେ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା-କାହିନିର ଏକଟି ଚରିତ୍ର କଲନା କରେ ନେଇ ଦେ । ଆରଲେ, ବେଶ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା-କାହିନି ପଡ଼ାର କାରଣେ ଖୋକା ବାନ୍ଧବ ଜଳ୍ୟ ଶୁଭକଳ ବରେ ଆନେ ନା, ଏ ସତ୍ୟାଇ ଗଲ୍ଲଟିତେ ପ୍ରତିକଳିତ ହୟେଛେ ।

শব্দার্থ ও টাকা

ধড়াস	— হৃৎস্পন্দনের প্রবল শব্দ।
সঙ্গমে	— অতি সাবধানে।
অন্তরাত্মা	— মন, জ্ঞান।
লঠন	— কাচে ঘেরা প্রদীপ।
হতভুব	— বুদ্ধি কাজ না-করা। প্রয়োজনে কী করতে হবে বুঝতে না-পারা।
রিভলবার	— এক হাতের মুঠিতে ধরে ঢালানো যায় এমন বন্দুক জাতীয় ছোট অস্ত্র।
ভাবান্তর	— অন্য ভাব। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ভাবভঙ্গি বা চিন্তার কোনো পরিবর্তন না-হওয়া অর্থে।
নিরক্ষণ	— উপরাখীন।
আআরাম	— থ্রাণপাখি, থ্রাণ।
অস্তে	— ভয়ে।
থার্ড ক্লাস	— সেকালে থার্ড ক্লাস বলতে এখনকার অষ্টম শ্রেণি বুঝায়।
ডিটেকচিভ	— গোরেন্দা।
সত্যেন ঘোৰ	— গোয়েন্দা উপন্যাসের একটি চরিত্র।
শাগরেদ	— শিষ্য, সহকারী।
কীর্তিকলাপ	— কৃতিত্বপূর্ণ কাজ, প্রশংসনযোগ্য কাজ।
ইনসপেক্টর	— পরিদর্শক, পুলিশ পরিদর্শককে বোঝানো হয়েছে। ইংরেজি Inspector.
প্রভাতী সংবাদপত্র	— সকালের খবরের কাগজ।
আদ্যোপাত্ত	— শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আদি ও উপাত্ত যোগে আদ্যোপাত্ত।
ওসি	— থানার ভারত্যাঙ্গ কর্মকর্তা। ইংরেজি Officer in-charge.
কলস্টেবল	— পুলিশের প্রহরী।
হকচকিয়ে যাওয়া	— ঘাবড়ে যাওয়া।
ছানাবড়া	— দুধের ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টি। এখানে ‘চোখ বড়ো’ বা অবাক অর্থে।
খোশগঞ্জ	— আমোদজনক বা মজার আলাপ।
মোহন	— দস্যু মোহন নামের একটি গোয়েন্দা সিরিজ গল্লের প্রধান চরিত্র।
গুলে খাওয়া	— কঠিন ও তরল একাকার করে খেয়ে ফেলা।
হানা দেওয়া	— আক্রমণ করা, তল্লাশির জন্য উপযুক্ত হওয়া।
গোয়েন্দা-কাহিনি	— রহস্য উন্মোচনমূলক কাহিনি। উপচরবৃত্তির মাধ্যমে রহস্য-উন্মোচনমূলক গল্ল।
সেক্রেটেন ব্রেক	— বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনির লেখক।
কনান ডয়েল	— আর্থার কোনান ডয়েল। বিখ্যাত ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনির লেখক।
নীহার গুণ্ট	— নীহাররঞ্জন গুণ্ট।
পাঁচকড়ি দে	— বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির লেখক।
আগাথা ক্রিস্টি	— ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনির লেখক।
বিভোর	— আজ্ঞাহারা, অভিভূত।

দীক্ষা

মোহাম্মদ নাসির আলী



কুলে বরাবর বাংলা পড়ান সতুবাবু—সতীনাথ বোস। তিনি সেদিন গরবাজির। হেডমাস্টার মশাই তাই মৌলবি সাহেবকে ডেকে বললেন, 'সতুবাবু আজ আসেননি দেখছি! ফোর্থ ক্লাসে আজকে বাংলার পিরিয়ডটা আপনিই কোনো রাকমে চালিয়ে দিনগে, কেমন?'

'জি, আচ্ছা' বলে মৌলবি সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। রাজি হলেন সত্য কিন্তু মনে-মনে প্রমাদ গুললেন। একে তো পড়াতে হবে বাংলা, তা-ও আবার ফোর্থ ক্লাসে অর্ধেৎ দুটের শিরোমণি লেবুদের ক্লাসে।

মৌলবি সাহেব সরল গোবেচারি গোছের লোক। ধর্মপ্রাণ এই নিরীহ সোকটিকে কুলের শিক্ষক-ছাত্র প্রায় সবাই ভঙ্গিশান্তির ঢাকে দেখত, তা হাড়া একটু ভয়ও করত। ভয়ের কারণ, স্থায় হেডমাস্টার মশাইও মৌলবি সাহেবকে সমীহ করে চলতেন। অনেক কাজেই তিনি মৌলবি সাহেবের পরামর্শ নিতেন।

কিন্তু মৌলবি সাহেব নিজে মনে-মনে ভয় করতেন লেবুকে। ফোর্থ ক্লাসে ফারসি পড়াতে গিয়ে লেবুর নিত্যনতুন উৎপাতের জ্বালায় তিনি অস্তির থাকেন। তার ওপর আজ আবার পড়াতে হবে বাংলা। গোলমাল এড়ানোর জন্য তিনি তাই ক্লাসে ঢুকেই এক বৃদ্ধি আঁটলেন। বললেন, ‘আজকে ক্লাসে সংক্ষিপ্ত একটি রচনা লিখতে দিচ্ছি তোমাদের; মনে করো, পাঁচশো করে টাকা দিলাম তোমাদের সবাইকে। সেই টাকা দিয়ে কে কী করবে লিখে দেখাও। কোনোরকম গোলমাল করবে না, আগেই বলে রাখছি।’

খাতা-গেনসিল নিয়ে রচনা লিখায় মনোযোগ দিল সবাই। লেবু এককোণ থেকে উঠে বলল, ‘পাঁচশো করে প্রতিজনকে দিলে সে যে অনেক টাকার ব্যাপার, স্যার। দু-পাঁচ হাজারেও কুলোবে না! এত টাকা দিয়ে ফেলবেন স্যার? কিছু কমিয়ে দিলেই তো ভালো।’

লেবুর এ অব্যাক্ত উত্তিতে মৌলবি সাহেব মনে-মনে রেগে গেলেন। বাইরে তা প্রকাশ না-করে বললেন, ‘যাকে বলে হোপলেস ছেলে, তুমি হয়েছ তা-ই। বললেই কি আর দেওয়া হলো? বললাম তো, মনে করে নাও পাঁচশো করে টাকা তোমরা পেলে।’

‘ওহো, তা-ই বলুন, মনে করতে হবে পাঁচশো করে টাকা আপনি দিলেন, বেশ।’ বলেই লেবু এক-মিনিটে কী যেন লিখে খাতা উলটে রাখল। মৌলবি সাহেবের তা দৃষ্টি এড়াল না।

ঘন্টা বাজবার আগেই সবার রচনা লেখা শেষ হলো। মৌলবি সাহেব খাতা দেখতে লাগলেন। কেউ লিখেছে, টাকা পেয়ে ব্যবসা করবে, কেউ দান করবে। কেউ-কেউ লিখেছে, গাঁয়ে ঝুল করে দেবে, গরিব ছেলেমেরেরা সেখানে বিনা বেতনে পড়বে। কিন্তু লেবু লিখেছে চমৎকার। দু-চার কথায় রচনা তার শেষ। লিখেছে, ‘কম টাকা হইলে বিশেষ চিত্তভাবনা করিয়া খরচ করিতাম। পাঁচশত টাকা পাইলে নিশ্চিতে পারের ওপর পা তুলিয়া বসিয়া থাইব।’

এবার আর মৌলবি সাহেব রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। লেবুর কান টেনে দিয়ে বললেন, ‘খাওয়াচ্ছি তোমাকে পারের ওপর পা তুলে। এসব কী লিখেছ, হোপলেস কাঁহাকা?’— বলেই পিঠের ওপর দু ঘা বসাতে যাবেন, এমন সময় দফতরি এল একটা নোটিশ নিয়ে। হেডমাস্টারের নোটিশ— টিফিনের ঘন্টা শুরু হলে পাঁচ মিনিটের জন্য সবাইকে হাজির হতে হবে কমন্ডক্ষে।

লেবুকে রেহাই দিয়ে মৌলবি সাহেব ছেলেদের নোটিশের মর্ম বুঝিয়ে দিলেন।

টিফিনের ঘন্টায় প্রায় সবাই এসে জড়ে হলো কমন্ডক্ষে। হেডমাস্টার মশাই বলতে লাগলেন, ‘চান্তীতলা ঘোষদের বাড়ির পাঠশালার বৃক্ষ পঞ্জিতমশাই বামাপদবাবুকে তোমরা সবাই জানো, আশা করি। তোমাদের অনেকেই তাঁর ছাত্র। তাঁর পাঠশালায় পড়ে এখানে এসেছ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি তোমাদের নামে আজ এক শুরুতর অভিযোগ করে পাঠিয়েছেন। তোমরা নাকি তাঁর ছাত্রদের অহেতুক ঠাট্টাবিদ্রূপ করো। তাঁর নমুনাও তিনি পাঠিয়েছেন। পাঠশালার দেয়ালে কে যেন ছাত্রদের নামে খড়ি দিয়ে লিখে রেখেছে:

বামা পাঠিতের পাঠশালা

বিদ্যে হয় না কঁচকলা—

দুহাতে দুই কলম দিয়ে

বসিয়ে রাখে গাছতলা।

অভিনব এ ছড়া শুনে ছাত্রো মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। হেডমাস্টার আবার বললেন, ‘আমার দৃঢ় ধারণা, এ ছড়ার রচনিতা তোমাদের ভেতরই রয়েছে। কে সেই কবিবর তা স্থীকার করলে কিছুই আমি বলব না তাকে, ওধু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দেব। তা না-হলে বুঝতেই পারছ, অপরাধীকে বের করে কঠিন সাজার ব্যবস্থা করতেই হবে আমাকে।’

তিনি চুপ করলেন। সবাই মুখ চাপ্যাচাপ্যি করতে লাগল। এমন সময় মাথা নিচু করে উঠে দাঢ়াল লেবু। বলল, ‘এ অন্যায় কাজ আমিই করেছি স্যার। অন্যায় বলে তখন বুঝতে পারিনি।’

কার যে এ কাজ হেডমাস্টার মশাই আগেই তার কিছুটা আঁচ করে রেখেছিলেন। অনুমানটা তাঁর সত্যিই হয়েছে দেখা গেল। এবার তিনি বললেন, ‘অন্যায় করেছ এবং তা স্থীকার করবার সংস্থাস তোমার আছে দেখে এবার আমি কিছুই বললাম না। ওরজনদের নিয়ে ঠাট্টাবিন্দুগ করা খুবই অন্যায়, বুঝতেই পারছ। কাজেই বলে রাখছি, ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের অন্যায় তোমার করেছ বলে শুনতে না পাই। আর হ্যাঁ, আরেকটা কাজ তোমাকে করতে হবে। কালকে স্কুলে আসবার পথে পশ্চিমশাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসতে হবে তোমাকে। পারবে তো?’
‘খুব পারব স্যার।’

‘বেশ, থ্যাঙ্ক ইউ। তোমরা সবাই এবার চিহ্নিত যেতে পার। চিফিনের পরে লেবু আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে দেখা করে যেয়ো।’ বলে তিনি চলে গেলেন।

একটু পরে লেবু এসে লাইব্রেরিতে চুকলে তিনি বললেন, ‘কাল থেকে তুমি মৌলবি সাহেবের সঙ্গে স্কুলে আসবে— কক্ষনো একলা আসবে না বলা রইল। একথা বলার জন্যই তোমাকে আসতে বলেছিলাম। আজ্ঞা, এবার তুমি যেতে পারো।’

লেবু চলে গেল। এ নতুন ব্যবস্থাটা কিন্তু মৌলবি সাহেবের মোটেই মনমতো হলো না। তিনি থ্রিক্ষেই বললেন, ‘আমার ঘাড়ে আবার এই ইবলিশটাকে চাপালেন কেন হেডমাস্টার মশাই?’

হেডমাস্টার মশাই হেসে বললেন, ‘ইবলিশ বশুন আর যা-ই বশুন, ছেলেটা কিন্তু ইন্টেলিজেন্স। এ ধরনের ছেলেদের বলতে পারেন, ‘আবাত আভারেজ’ সাধারণের ব্যতিক্রম। সুযোগ পেলে, সুপথে চালিত হলে এরাই একদিন মানুষের মতো মানুষ হয়।’

এরপর মৌলবি সাহেবে আর ড্রিস্কি করা সঙ্গত মনে করলেন না। মৌলবি সাহেবে ভিন্ন জেলার লোক। লেবুদের পাড়ায় কাজিবাড়িতে জায়গির থাকেন। এ ব্যবস্থার পর থেকে লেবুকে রোজই মৌলবি সাহেবের সঙ্গে স্কুলে আসতে হয়— পথে কারও সঙ্গে দুষ্টুমি করার তেমন সুযোগ আর হয় না।

কিছুদিন পরে স্কুলে শুরু হয়েছে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা। কৃটিনমাধ্যিক পরীক্ষার শেষের দিনে মৌলবি সাহেবের ওপর ভার পড়েছে ফোর্থ ক্লাসে গার্ড দেবার। সবাইকে বাদ দিয়ে লেবুর ওপর তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। রাতদিন দুষ্টুমি আর বাঁদরামি করে ছেলেটি পরীক্ষায় কী করে ভালো নম্বর পায়, সে রহস্য তিনি ভেদ করবেন। নিয়মিত পড়াশোনা না করেও ভালো নম্বর পাবার সহজ পথ হলো পরীক্ষার সময় নকল করা। লেবু যা হেলে, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

আড়চোখে কিছুক্ষণ লেবুর হাবভাব লক্ষ করে মৌলবি সাহেবের মনে হলো অনুমানটা তাঁর যেন মিথ্যে নয়। লেবু কিছুক্ষণ পরপরই বুকপকেটটা বাঁ হাতে আঙুল দিয়ে ফাঁক করে কী যেন দেখে নিচ্ছে, তারপর আবার লেখায় মন দিচ্ছে।

ব্যাপারটা দু-একবার দেখেই মৌলিবি সাহেব লেবুর কাছে এসে হঠাতে বললেন, ‘দেখি তোমার জামার পকেটে কী আছে?’

লেবু আমতা আমতা করে বলল, ‘ও কিছুই না স্যার।’

‘কিছুই না কী রকম দেখি।’ বলেই তিনি বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করলেন সিগারেটের একটা প্যাকেট। আর যায় কোথায়! মৌলিবি সাহেব বলে উঠলেন, ‘ছেলের এ বিদ্যোৎ হয়েছে দেখছি! সাধে কী আর হোপলেস বলি?’

বলেই তিনি সিগারেটের প্যাকেটটা যেমনি খুলেছেন অমনি একটা অঙ্গুত কাও ঘটে গেল। হঠাতে তিনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন।

ব্যাপারটা হলো— সিগারেটের খালি প্যাকেটটার ভেতর ছিল কয়েকটা আরশোলার বাচ্চা। কুল ছুটির পরেই পুরুরে ছিপ ফেলে মঙ্গ্য শিকারের আঘোজন করেছে লেবু আগে থেকেই। আরশোলাগুলো হলো বড়শির টোপ। হঠাতে মুক্তি পাওয়ার আশায় আনন্দে একটা আরশোলা গিয়ে আশ্রয় খুঁজতে শাগল মৌলিবি সাহেবের গলার কাছে দাঢ়ির নিচে। সেটাকে কাবু করার আগেই দু-তিনটা চুকে পড়ল তাঁর গাঞ্জাবির ঢেলা আস্তিনের ভেতর। সটান ভেতরে গিয়ে উঠল। ভালো করে ব্যাপারটা বুবাবার আগেই উর্ধ্ববাহ মৌলিবি সাহেব তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন। বে-দিশা হয়ে লাফাতে লাফাতে তিনি পড়লেন গিয়ে পাশের একটি ছেলের ডেক্সের ওপর। ডেক্সের দোয়াত-কলম সব উলটে পড়ল গিয়ে ছেলেটার কোলে। কালি পড়ে জামাকাপড়, পরীক্ষার খাতা সব একাকার হয়ে গেল। মৌলিবি সাহেবের সেদিকে খেয়াল করার ফুরসত নেই। তিনি তখনও কেবলই লাফাতেন।

আসল ব্যাপার কিছুই বুঝতে না-পেরে অবাক ছেলেরা হাঁ-করে চেয়ে আছে কলম তুলে। পাশের কামরা থেকে সতুবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন তাই রক্ষা। জামার নিচে হাত গলিয়ে অতি কষ্টে তিনি আরশোলা কটা বের করলেন। এতক্ষণ পরে নিষ্কৃতি পেয়ে মৌলিবি সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, ‘হোপলেস, সতুবাবু, একেবারেই হোপলেস। পকেটে করে নিয়ে এসেছে কি-না তেলাপোকা। যতসব হোপলেস বে-আদব।’

সতুবাবু অতি কষ্টে হাসি চেপে বেরিয়ে গেলেন।

ছুটির পর লেবুর ডাক পড়ল হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে। তার পেছনে পেছনে গেল আর সব ছেলে। কোনো রকম ভূমিকা না করেই লেবুকে হেডমাস্টার জিজেস করলেন, ‘পকেটে করে ওগুলো এনেছিলে কেন?’ নিরুত্তর লেবু নতমুখে দাঢ়িয়ে রইল।

তিনি আবার তাড়া দিয়ে উঠলেন, ‘কী হে, কথার জবাব দিচ্ছ না যে?’

কিছুক্ষণ পর লেবু বলে উঠল, ‘আমার তো কোনও দোষ নেই, স্যার। উনিই তো ইচ্ছে করে আমার পকেট থেকে টেনে এগুলো বের করলেন।’

‘তা বুবেছি, কিন্তু তুমি কেন ওগুলো পকেটে করে কুলে এনেছিলে?’

পুরুরে ছিপ ফেলবার কথাটা গোপন করে লেবু বলল, ‘আরশোলা পুষব বলে ধরে এনেছিলাম স্যার।’

লেবুর কথা শনে সবাই একযোগে হেসে উঠল।

হেডমাস্টার বললেন, 'দুনিয়ার আর কোনো জিনিস পেলে না পুঁথতে, তাই আরশোলা পুঁথতে সাধ হয়েছে। তোমাকে আমি আরশোলা পোবাচ্ছি। ঘরের ওই কোণে আরশোলা আছে। যাও, ওখানে দেয়ালমুখো দাঁড়িয়ে থাকোগে। আধঘন্টা পর তোমার ছুটি।'

মিনিট পাঁচক পরে মৌলবি সাহেব ছাতা হাতে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তা-ই দেখে লেবুর মাথায় চট করে একটা বুকি এসে গেল। হেডমাস্টারকে সে বলল, 'স্যার, এখন রোজ কুলে আসবার সময় মৌলবি সাহেবের সঙ্গে আসি।' 'হ্যাঁ, তা তো আমার জানাই রয়েছে।'

'কিন্তু— কিন্তু যাবার সময়...'

লেবু কী বলতে চাইছে হেডমাস্টার মশাই তা সহজেই বুঝে ফেললেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অতি কষ্টে হাসি চেপে তিনি বলে উঠলেন, 'বুবেছি, বুবেছি, আর বলতে হবে না। কুলে আসওয়ার সময় পাহাড়াধীনে এলে যাবার সময়ও সে-ব্যবস্থা হবে না কেন, এই তো বলতে চাইছ? যুক্তি যে তোমার অকাট্য তা মানতেই হবে। যাও, কিন্তু পথে দুষ্টমি কোরো না। আর তা ছাড়া মৌলবি সাহেবকে, যাকে সবাই আমরা মান্যগণ্য করি, তাঁকে বিরক্ত করতে যেয়ো না।'

'আচ্ছা স্যার'- হেডমাস্টারের কথায় সায় দিয়ে লেবু বেরিয়ে গেল। কিন্তু যেতে যেতে ভাবতে লাগল মানুষ নিজে যা মনে করে সবসময় তা ঘটে কি? অগটন তো কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ঘটে না। আজকের ব্যাপারটা কি লেবুর ইচ্ছায় ঘটেছে? লেবু কি চেঞ্চেছিল মৌলবি সাহেব তাকে সন্দেহ করবেন আর পকেট থেকে আরশোলাৰ বাক্সটা টেনে বের কৰবেন? অথবা তিনি কি মনে করেছিলেন ওটা কুলেই এমন বিপদ ঘটবে?

লেবুদের বাড়ি থেকে কুলে যেতে একটা ছোটো খাল পার হতে হয়। খাল পেরিয়েই কুমোরপাড়া। পাড়াটার গী-ঘৰে চলে গেছে পায়ে-চলা সরু পথ। সময় বাঁচানোৰ জন্য সোজা পথে যেতে হলে এটাই সে পথ। মৌলবি সাহেবের সঙ্গে এ পথেই সেদিন লেবু যাচ্ছিল কুলে। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল একটা কাঠবিড়লি। কাঠবিড়লাগিটা মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে কী যেন মুখে দিচ্ছিল। লেবুৰ জন্য সুবর্ণ সুযোগ। মুহূর্তে সে হান-কা঳-পাত্র ভুলে গেল। পকেট হাতড়ে দেখল, রবারের ছোট গুলতিটা ঠিকই আছে, মাটিৰ তৈরি গুলিও আছে দু-তিনটা। কাঠবিড়লি শিকারের এমন সুযোগ হেলায় হারানো যায় না। মৌলবি সাহেবের দৃষ্টি এড়িয়ে এক মুহূর্তে সে তার গুলতিটার সন্দ্বয়ব্যাহার করে ফেলল।

আমগাছটাৰ ঠিক পাশেই তৃপ্তিকারে সাজানো রয়েছে কুমোরদেৱ অনেকগুলো মেটে হাঁড়ি-পাতিল। বেচাৱা লেবুকে হতাশ কৰে দুষ্ট কাঠবিড়লি তিড়িং কৰে লাখিয়ে উঠল গিয়ে আমগাছেৰ ডগাখা; এদিকে লেবুৰ লক্ষ্যভূষিত গুলিটা লাগল গিয়ে একটা হাঁড়িৰ গায়ে। গাছেৰ নিচে সেই হাঁড়িটা যেই ভেঙেছে অমনি ভূপেৱ ওপৱ থেকে গড়িয়ে পড়ল আৱো পনেৱো-বিশটা হাঁড়িপাতিল, সবকটাই ভেঙে চুৱমাৰ। গলকে প্ৰলয়কাণ্ড ঘটে গেল। আওয়াজ হলো যেন একটা বোমা ঘণ্টল এইমাত্ৰ।

কীসে কী হলো মৌলবি সাহেব কিছুই বুঁথতে পারলেন না। পিছনে চেয়ে দেখলেন, লেবু ততক্ষণে হাওয়া। কুমোরবাড়ি থেকে চিৎকাৱ কৰে ছুটে এল আধগাগলাগোছেৰ একটা লোক। এসে সামনেই পেল মৌলবি সাহেবকে। হাঁড়ি ফাটাৰ শব্দে হতভয় হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটা এসেই তাৰ লম্বা কোৰ্তাৰ খুঁট টেনে ধৰল। বলল, 'চাইয়া দেখিবাৰ লাগছেন কী, দাম না-দিলে বাইতে দিয়ু না।'

ମୌଳବି ସାହେବ ଆରା ହତଭ୍ୟ । ତିନିଏ ରେଗେ ବଲେ ଉଠିଲେନ, ‘କାପଡ଼ ହେଡ଼େ କଥା ବଲୋ ବେ-ଆଦବ କାହାକମ । ତୋମାର ହାତି କି ଆମି ଫାଟିଯେଇ ସେ ଦାମ ଦେବୋ?’

କିନ୍ତୁ କାର ଧୂକି କେ ଶୋନେ? ଆଧ-ପାଗଙ୍ଗା ଲୋକଟା ନାହୋଡ଼ିବାନ୍ଦା । ବଲେ ଉଠିଲ, ‘ଏକଟା ଛେଇଲାରେ ଲଈଥା ରୋଜ-ରୋଜ ଆପନେ କୁଳେ ସାରେଲ ନା ଏହାନ ଦିଯା? ହେଇ ଛେଇଲାଡାର ଏହି କାମ । ହେଇ ତୋ ପାହେର ଥିଲେ ଦୌଡ଼ ମାରହେ, ଦେଖିଛି ସବ ।’

ପେହଳେର ଏକଟା ବାଢ଼ିର ଆଡ଼ାଲ ଥେକେ ଉକି ଦିଯେ ଲେବୁ ସବ ଦେଖିଲ । ଏକେଇ ବଲେ, ଉଦୋର ପିଣ୍ଡ ବୁଧେର ଘାଡ଼ । ଅବଶ୍ୟେ ମୌଳବି ସାହେବ ଅତଭ୍ୟଲେ ହାତିର ଦାମ ନଗଦ ଦିତେ ନା ପେରେ ହାତେର ଛାତାଟା ବାଁଧା ରାଖଲେନ । ଛାତା ବାଁଧା ରେଖେ କୁଳେର ପଥ ଧରଲେନ । ବଲଲେନ, ଦୁ ଦିନ ପର ମାଇଲେ ପେଲେ ଛାତାଟା ଛାତିଯେ ନେବେନ ।

ଶୀତ ଶ୍ରୀଅ ବର୍ଷା ସକଳ ଝାତୁତେ ମୌଳବି ସାହେବେର ହାତେ ଥାକତ ଓହି ଏକଟା ଛାତା, କାଂଧେ ହଲଦେ ସୁତୋର ବୁଟାତୋଳା ବଡ଼ୋ ଏକଖାନା କୁମାଳ । ଥରୋଜନେର ସମୟ ଯା ବ୍ୟବହତ ହତୋ ଜାଯନମାଜ ହିସେବେ । ବଲତେ ଗେଲେ ଏ ଦୂଚି ବନ୍ତ ଛିଲ ତାର ନିତ୍ୟସଙ୍ଗୀ । ଆଜଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଗେଲ କୁଳେର ପଥେ ମୌଳବି ସାହେବେର କାଂଧେ କୁମାଳିଥାନା ଆହେ କିନ୍ତୁ ହାତେ ଛାତାଟି ନେଇ ।

ଏହିକେ ଭିନ୍ନ ପଥେ ଏସେ ଲେବୁ କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ବସେ ଛିଲ ତାର କୁମାଳେ । ବସେ ବସେ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ଗୁଣଛିଲ କୋନ ସମୟ ତାର ଡାକ ପଡ଼ିବେ ହେଡ଼ମାସ୍ଟାରେର କାମଗାର । କିନ୍ତୁ କି ଆଶ୍ରୟ, ଡାକ ପଡ଼ିଲ ନା । ଫାରସି ପଡ଼ାତେ କୁମାଳେ ଏସେ ମୌଳବି ସାହେବ ନିଜେଓ କିନ୍ତୁ ବଲଲେନ ନା । ସାଭାବିକ କାରଣେଇ ତାକେ ଆଜ ବଡ଼ୋ ବିମର୍ଶ ଦେଖାଇଲ ।

ଲେବୁର ମନଟା ହଠାତ୍ ଭରେ ଗେଲ ମୌଳବି ସାହେବେର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିତେ । ଅନୁତାପଣ କମ ହଲୋ ନା ତାର । ବାଢ଼ି ଗିଯେଓ ଦେ ମନେ ଶାନ୍ତି ପେଲ ନା ।

ପରେର ଦିନ ।

କୁଳେ ସାହେବର ସମୟ ହେଁଲେ । ଲେବୁର ପା ନଡ଼ିଛେ ନା ଆଜ କାଜିବାଢ଼ି ଗିଯେ ମୌଳବି ସାହେବେର ସାମନେ ଦାଢ଼ାତେ । ତରୁ ଏକ-ପା ଦୁ-ପା କରେ ନିତାନ୍ତ ଅଗରାଧୀର ମତୋ ମତୋ ଏଗିଯେ ଗେଲ । ଅଗରାଧୀର ମତୋହି ମତୋହି କାହାରି ସରେର ବାଇରେ ଦାଢ଼ିଯେ ରାଇଲ । ଦାଢ଼ିଯେ ଶୁନିଲେ ଲାଗିଲ, ବୁଢ଼ୋ କାଜି ସାହେବେର ସନ୍ଦେ କଥା ବଲଛେଲ ମୌଳବି ସାହେବ । ବଲଛେଲ, ‘ମାସ୍ଟାରି କାଜ ଆର ଭାଲୋ ଲାଗଛେ ନା । ଏଇ ଚେଯେ ଗୌଯେ ଗିଯେ ଚାବବାସ କରାଓ ଭାଲୋ । କାଳ ବାଢ଼ିର ଚିଠି ପେଲାମ— ଛେଲେପିଲେରା ଭୁଗଛେ ଅସୁଖେ-ବିମୁଖେ । ତାର ଓପର ଆବାର ବିପଦ ଦେଖୁନ, ବାପଦାଦାର ଆମଲେର ସାମାନ୍ୟ ଏକଟୁ ଜୋତଜୁମି ଛିଲ, ତା-ଓ ନିଲାମେ ଉଠିଲେ ଚଲେହେ ବାକି ଖାଜନାର ଦାରେ । ଏହି ଚାକରି କରେ ଦୂରେ ଥେକେ କତ ଦିକ ଆର ସାମଲାବ!’

ବଲତେ ବଲତେ ବାଇରେ ଏସେ ଦେଖଲେନ, ଲେବୁ ଦାଢ଼ିଯେ ଆହେ । ତାକେ ବଲଲେନ, ‘ଆଜ ଆର କୁଳେ ସାବ ନା ଲେବୁ । ମନଟା ତେମନ ଭାଲୋ ନେଇ । ଏହି ଦରଖାଙ୍ଗଟା ଦିଯୋ ହେଡ଼ମାସ୍ଟାର ମଶାଇକେ ।’

ମୌଳବି ସାହେବ ଲେବୁକେ କାହେ ଟେଲେ ନିଯେ ବୁକେ ଜାହିୟେ ଧରଲେନ, ‘ନା ଲେବୁ, ତୁମ ତୋ ଇଚ୍ଛା କରେ କୋନୋ ଅନ୍ୟାଯ କରନି— ସବଇ ହଟନାଚକ୍ରେ ସଟେ ଗେଛେ । ତୋମରା ଭାଲୋ ହବେ, ମାନୁଷ ହବେ, ଏହି ତୋ ଆମାଦେର କାମନା ।’

ଲେବୁ ସେଇ ମୌଳବି ସାହେବେର କାହ ଥେକେ ସେଦିନ ଏକ ନତୁନ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରଲ ।

লেখক-পরিচিতি

মোহাম্মদ নাসির আলী ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বিভাগপুরের ধাইদা থামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার শিশু বিভাগের পরিচালকের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'নওরোজ কিতাবিজ্ঞান' নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'মণিকণিকা', 'শাহী দিনের কাহিনী', 'ছোটদের ওমর ফারুক', 'বোকা বকাই', 'লেবু মামার সংগ্রহ' ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র লেবু। শিক্ষক ও বস্তুদের কাছে সে দুটের শিরোমণি হিসেবে পরিচিত। নানা ধরনের উৎপাত ও দুষ্টির কারণে সবাই তার নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করত। একবার চতুর্ভুজের এক পাঠশালার দেয়ালে আপত্তিকর ছড়া লেখার অভিযোগ পেয়ে হেডমাস্টার সব ছাত্রকে ডেকে জানতে চাইলেন, কে এই কাজ করেছে। লেবু দাঁড়িয়ে সেই অন্যায় কাজের দায় দেখার করল। তার এই সমসাহস দেখে হেডমাস্টার খুশি হলেন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, সে যেন আর একা একা কুলে না আসে। মৌলিবি সাহেবের সঙ্গেই প্রতিদিন কুলে আসার নির্দেশ দিলেন। লেবু পড়ল বিপদে। মৌলিবি সাহেবের সঙ্গে আসার পথে সে কারো সঙ্গে দুষ্টি করার সুযোগ পেত না। তবে একদিন ঘটল অট্টন। কুমোরপাড়ার পাশ দিয়ে যাওয়া সময় লেবুর চোখে পড়ল এক কাঠবিড়ালি। কাঠবিড়ালিটি শিকার করতে গেলে ভেঙে পড়ল পনেরো-বিশটি হাঁড়ি। এ অবস্থা দেখে লেবু দৌড়ে পালাল। কিন্তু কুমোরপাড়া থেকে এক লোক এসে ধরল মৌলিবি সাহেবকে। হাঁড়ির দাম হিসেবে বেচারা মৌলিবি সাহেবের বাঁধা রাখলেন নিজের ছাতাটা। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে লেবুর অনুত্তাপ হলো। পরদিন সে মৌলিবি সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল। মৌলিবি সাহেব তাকে ঝুকে জড়িয়ে নিলেন। শিক্ষকের এই মহানুভবতা লেবুকে বদলে দিল।

নিছক আনন্দ যেমন মানুষকে বিপদে ফেলে, ক্ষমা এবং আন্তরিকতা তেমন মানুষকে সুপথে নিতে পারে।

শব্দার্থ ও টীকা

গরহাজির	— অনুপস্থিতি।
ফোর্থ ক্লাস	— সেকালে ফোর্থ ক্লাস বলতে এখনকার সঙ্গম শ্রেণি বোায়।
মৌলিবি	— ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ, মুসলিম পণ্ডিত।
প্রমাদ	— বিপদের আশঙ্কা।
উৎপাত	— উপদ্রব।
অবান্ন	— অপ্রাসঙ্গিক, মূল প্রসঙ্গের বহির্ভূত।
হোপলেস	— আশাহীন, নির্বোধ। ইংরেজি Hopeless.
কাঁহাকা	— কোথাকার।
ইবলিশ	— শয়তান।
ইন্টিলিজেন্ট	— বুদ্ধিমান, জ্ঞানী।
বিন্দুকি	— বিতীয়বার উক্ত, বিতীয় দফায় উল্লেখ।

জায়গির	— বিনা খরচে কোনো পরিবারে থাকা-খাওয়ার বাবস্থা।
হাফ-ইয়ালি	— অর্ধ-বার্ষিক। ইংরেজি Half-yearly.
টোপ	— বরশিতে গাঁথা মাছের খাদ্য।
আঙ্কিল	— কোট বা জামার হাতা।
বে-দিশা	— দিশাহারা।
নিঃস্তি	— মুক্তি, অব্যাহতি।
গুলতি	— মাটির চিল ছোড়ার ধনুকবিশেষ।
মেটে	— মাটি দ্বারা নির্মিত।
উদোর পিণ্ডি-	
বুধোর ঘাড়ে	— একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো।
কাছারি ঘর	— বিচারালয়, অফিস, বৈঠক ঘর।
দরখাস্ত	— আবেদন, আরজি।
দীক্ষা	— উপদেশ, শিক্ষা।

পদ্য লেখার জোরে

মাহমুদুল হক



এক দেশে ছিলেন এক বাদশাহ। হাতি-ঘোড়া সেপাই-সান্ত্বি কোনোকিছুই তাঁর অভাব ছিল না। বাদশাহর নাম শমশের আলীজান।

কোনো এক সময় বাদশাহ খুব অসুবিধায় পড়লেন। তাঁর নারের সঙ্গে মিলে যায় রাজ্য এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ছুতোর, কামার, গাছকাটা শিউলি এদের সকলের নামও শমশের। গোটা রাজ্য শমশেরময় হয়ে আছে এককথায়। তাই বাদশাহ একদিন উজির-নাজির, পাত্র-মিত্র, সভাসদ সবাইকে ডেকে দরবারে ঘোষণা করলেন— আমার ক্ষমতা তোমাদের সকলের চেয়ে খুব কম করে হলেও তিন গুণ বেশি; সুতরাং আজ থেকে আমার নামকে তিন দিয়ে গুণ করে ঠিক এইভাবে উচ্চারণ করতে হবে—

শমশের

শমশের

শমশের আলীজান

এই ঘোষণায় বিশেষ করে উজির আকেল আলী খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'বাদশাহ নামদার দীর্ঘজীবী হউন।'

উজির আকেল আলী ছিলেন বাদশার সবচেয়ে প্রিয় গান্ধি। তাঁর ওপর বাদশাহের বিশ্বাসও অগাধ। বাদশাহ ধরে নিয়ে আসতে বললে তিনি বেঁধে নিয়ে আসেন। বাদশাহ হাঁচলে-কাশলে তিনি ডুরে কেঁদে ওঠেন।

একদিন হয়েছে কি, বাদশাহ উজিরকে সঙ্গে নিয়ে তিনমহল প্রাসাদের পাশ কাটিয়ে হাওয়া খেয়ে বেরোবার সময় দেখেন প্রাচীরের গায়ে একরাশ হিজিবিজি লেখা। বাদশাহ বললেন, 'দাঁড়াও, পড়ে দেখা যাক।'

আকেল আলী আকেল আলী

দেব তোরে কী,
ঘুমের ঘোরে চাঁদিতে তোর
গাঁটা মেরেছি।

উজির গরগর করতে করতে বললেন, 'ঝ্যা, এ কি সত্য কথা?'

বাদশার বললেন, 'খেপেচো নাকি। কেউ ঠাট্টা করে লিখেছে আর কি!'

বাদশার কথা শেষ হতে না-হতেই উজির চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, 'কী সক্রোনাশ! ওই দেখুন বাদশাহ নামদার, বাঁ দিকের প্রাচীরে আপনার নামেও কী কথা সব লিখে রেখেছে।'

বটে বটে, বলে বাদশাহ পড়ে দেখলেন—

শমশের
শমশের
শমশের আলীজান,
আমরকল
জামরকল
কু ষেঁচু সবই খান।
শমশের
শমশের
শমশের আলীজান,
খিটখিটে
মিটমিটে
শকুনের মতো জান।

রাগে আগুন হয়ে বাদশাহ বললেন, 'দেখেছ কী ওটা? আমার জান বলে শকুনের মতো। এ্য় এত বড়ো কতা!'

উজির বললেন, 'শূলে চড়াব বাদশাহ নামদার, শূলে চড়াব! যদি না-পারি আমার নাম আকেল আলীই নয়। ইশ, কী বিচ্ছিরি কতা!'

এরপর অন্যান্য দিনের মতো বাদশাহ দরবারে বসলেন। বললেন, 'কার কী আর্জি আছে পেশ করো।' নাজির উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাদশাহ নামদার, আমার নামদার, আমার বাড়ির উঠোনে আজ সকালে একটা ঘৃড়ি উড়ে এসে পড়েছিল, তাতে সব বাজে বাজে পদ্য লেখা।'

বাদশাহ গঞ্জিরভাবে বললেন, 'কী লেখা ছিল? উজির আবৃত্তি করে বললেন—

শমশের শের নয়

লেজকাটা ইগুমান,

বিড়ালের ডাক শুনে

দেন তিনি পিটটান।

কঁঠালের মতো মাথা

আকেল আলীটার

যাসখেগো বুদ্ধি এঙ্গার এঙ্গার।

সকলে গাঞ্জীর্য বজায় রাখবার জন্য মুখ লিচু করে থাকল।

সভাসদদের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি আবৃত্তি করতে শুরু করে দিলেন—

তিনগুণ শমশের পেঞ্চায় ভূঁড়ি

দশগুণ বোকামিতে দেয় হামাগুড়ি।

খাদানেকো টাকমাথা আবলুশ কাঠ

বিশগুণ লোভে টেকো ঘোরে মাঠ-ঘাট।

বাদশাহ থেপে উঠে বললেন, 'তার মানে? তোমরা সব পাঞ্চা দিঙ্গ নাকি?'

সভাসদ বললেন, 'বাদশাহ নামদার বেয়াদবি মাফ করবেন, আজ সকালে আমার বাড়ির সামনেও একটা ঘূড়ি এসে পড়ে, তাতে লেখা ছিল ওইসব।'

বাদশাহ বিরক্ত হয়ে সেদিনকার মতো দরবার ভেঙে দিলেন।

পরদিন উজির দরবারের দিকে আসবার পথে দেখেন গাছের ডালে ঝুলছে রঙিন এবং বেশ বড়ো একটা ঘূড়ি।

ঘূড়িটার ওপর রং দিয়ে তাঁর মুখ খুব বিশীভাবে আঁকা। আর তাতে লেখা :

আকেল আলী উজির বটে

কুলোপানা কান

পেটের পিলে বাড়ছে কেবল

গোলায় বাঢ়ে ধান।

উজির তঙ্গুনি বাদশাহের কাছে ঝুটলেন। বললেন, 'কঁহাতক আর সহ্য করা যায় বাদশাহ নামদার, একটা বিহিত কর্তৃত হবে।' বাদশাহ বললেন, 'আজ থেকে রাজ্যময়া আইন জারি করা গেল, ঘূড়ি ওড়ানো আর তৈরি করা দুটোই বন্দো। যারা মানবে না, তাদের হাত কেটে দেওয়া হবে, হাত।' উজির বললেন, 'খাসা আইন হ�ঁচেছে বাদশাহ নামদার। এইবার বাহাধনেরা জন্ম হবে, আঁ!'

পরদিন দেখা গেল শাহিমহলের সামনের ঘরদামে রাজ্যের যত ছেলেপিলেরা শুকনো কলাপাতার তৈরি গোল গোল কী সব ঘূড়ির মতো ওড়াচ্ছে।

বাদশাহ হাঁক পেড়ে বললেন, 'ধরো ওদের, হাত কেটে দাও ওদের সকলের। বাদশাহের হৃকুমে ছেলেদের সবাইকে গৱাঁধা করে ধরে আনা হলো।' বাদশাহ চিংকার করে বললেন, 'তোমরা আমার হৃকুম অমান্য করে ঘূড়ি উড়িয়েচ কেন?'

ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ଏକଜନ ଚଟପଟେ ଗୋହର ଜବାବ ଦିଲ, 'ଆମରା ସୁଡ଼ି ଓଡ଼ାଇନି । ସୁଡ଼ି ତୋ ଚାରକୋଣ୍ଡୋଲା କାଗଜେର ତୈରି ହୟ ।'

ବାଦଶାହ ବଲଲେନ, 'ସା ଓଡ଼େ ତାଇ ସୁଡ଼ି । ଛେଳେଟି ଖୁବ ଆଶର୍ଯ୍ୟ ହୟେ ବଲଲେ— ତା ହଲେ ପାଖି, ତୁଳୋ, ଧୁଲୋ, ହାତ୍ୟାର ଜାହାଜ ସବଇ କି ଘୁଡ଼ି? ପାଖିଦେର ଉଡ଼ିତେ ଦିଚେନ କେନ? ଓଦେରଙ୍କ ବାରଗ କରେ ଦିଲ । '

ବାଦଶାହ ଗର୍ଜନ କରେ ବଲଲେନ, 'ଚୋପରାଓ! ବ୍ୟାପାରଟା ଗନ୍ଧଗୋଲେର ଟେକଛେ । ଠିକ ହାୟ, ପଞ୍ଚିତ କଇ!

ପଞ୍ଚିତ ଏସେ ବଲଲେନ, 'ବାଦଶାହ ନାମଦାର, ବଇ ତୋ ଅନ୍ୟରକମ କଥା ବଲେ । ଯାହା ସୁରଧୂର କରେ ଓଡ଼େ ତା-ଇ ସୁଡ଼ି ।'

ଛେଳେଟି ଚୋଖ ବଡ଼ୋ ବଡ଼ୋ କରେ ବଲଲେ, 'ସୁରଧୂର କରେ ଆବାର କିଛି ଓଡ଼େ ନାକି! ଆପଣି କିଛିଇ ଜାନେନ ନା ଦେଖଛି! ଓଡ଼େ ତୋ ପତପତ କରେ ଆର ଫୁରବୁଲୁ କରେ ଘୋରେ ।'

ପଞ୍ଚିତ ବଲଲେନ, 'ଥାମୋ ଦିକି, ବେଶି ହ୍ୟାତୋର ହ୍ୟାତୋ କେନ ବାପୁ । ତା ବାଦଶାହ ନାମଦାର ଏକଟୁ ସମୟ ଲାଗବେ, ବିଷୟଟି ବିବେଚନ କରେ ଦେଖିତେ ହବେ କିମ୍ବା ।'

ବାଦଶାହ ବଲଲେନ, 'ବେଶି ସମୟ ଦିତେ ପାରବ ନା । ଏକୁନି ନତିପତୋର ହାତଡେ ଦ୍ୟାକୋ । ଏଟା ବିହିତ କଣ୍ଠେଇ ହବେ ।'

ପଞ୍ଚିତ ବଲଲେନ, 'ଏ କି ଆର ଗୋଲାଯ ଧାନ ଜମାନେ ବାଦଶାହ ନାମଦାର, ଏ ହଲୋ ଗିଯେ ଆପଣାର ଦଶମୁନେ ଅଭିଧାନ ହାଟାଧାଟିର ବ୍ୟାପାର, ସମୟ ଦିତେଇ ହବେ ।'

ବାଦଶାହ ଏକଟା ଆତ୍ମଲ ତୁଲେ ଦେଖିଯେ ବଲଲେନ, 'ଦିଲାମ । ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ।'

ଚଟପଟେ ଛେଳେଟି ପଞ୍ଚିତକେ ବଲଲେ, 'ଚଲୁନ ଆମରାଓ ଆପଣାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବ ।'

ପଞ୍ଚିତ ବକ୍ରବକ କରତେ ଓଦେର ସବାଇକେ ନିଯେ ନିଜେର ଘରେର ଦିକେ ଗେଲେନ । ଘରେର ଭିତର ଥେକେ ଧାର୍କା ଦିଯେ ଗଡ଼ିଯେ ଗଡ଼ିଯେ ବେର କରେ ନିଯେ ଏଲେନ ଦଶମୁନେ ଏକ ବାଙ୍ଗିଲ । ତାରପର ବିଡ଼ିବିଡ଼ କରେ ଆତ୍ମଲ ଗୁଲେ ବଲଲେନ, 'କ ସ ଗ ସ-ହ-ଯେ ସୁଡ଼ି । ସକୋନାଶ କରେଛେ! ଏ ଯେ ବ୍ୟାନଜୋନ ବନ୍ଦେର ଚାର ନମ୍ବୋର । ଗୋଟା ତାଢାଟାଇ ଥୁଲାତେ ହବେ । ସୁଡ଼ି ଶବ୍ଦୋ ପାଓୟା ଯାବେ ଏକେବାରେ ସେଇ ପୋଡ଼ାର ଦିକେ ।'

ଛେଳେରା ସବାଇ ବଲଲେ, 'ଆପଣି ବୁଡ଼ୋ ମାନ୍ୟ, ଟାନା-ହ୍ୟାଟ୍ରୋ ଆପଣାର ଶରୀରେ କୁଲୋବେ ନା । ଆପଣି ସାମନେର ଦିକଟା ଧରେ ଥାକୁନ ଆମରା ସବାଇ ମିଳେ ବାଙ୍ଗିଲଟା ପିଛନେର ଦିକେ ଗଡ଼ିଯେ ନିଯେ ଘାଞ୍ଚି, ତା ହଲେଇ ଚଟି କରେ ଖୋଲା ହୟେ ଯାବେ ।'

ଛେଳେରା ସବାଇ ଏକଥୋଗେ ବାଙ୍ଗିଲଟା ଠେଲତେ ଠେଲତେ ଗଡ଼ିଯେ ପିଛନେର ଦିକେ ନିଯେ ଚଲଗ । ପଞ୍ଚିତ ଧରେ ବସେ ରଇଲେନ ସାମନେର ଦିକଟା ।

ତାରପର ହଲୋ କି, ବାଙ୍ଗିଲଟା ଠେଲତେ ଠେଲତେ ଛେଳେରା ଏକସମୟେ ହାତିଯେ ପଡ଼ିଲ, କେନନା ସେଟା ହିଲ ବିରାଟ । ଓଜନେଓ ଦଶ ମଗେର ସମାନ । ତାଇ ନା ପେରେ ଏକସମୟ ସବାଇ ଛେଡେ ଦିଲ । ଏକ ପଲକେ ସଡ଼ସଡ଼ କରେ ସେଟା ଆଗେ ମତୋ ଆବାର ଜଡ଼ିଯେ ଗିଯେ ଏକ ଧାର୍କାଯ ପଞ୍ଚିତକେ ଛୁଡ଼େ ଦିଲେ ସାମନେର ସମୁଦ୍ରେ ।

ଛେଳେରା ସବାଇ ତକୁନି ବାଦଶାହର କାହେ ଛୁଟି ଗିଯେ ନାଲିଶ ଜାନାଲ । ବଲଲେ, 'ବାଦଶାହ ନାମଦାର, ଦେଖୁନ ପଞ୍ଚିତର କୀ କାଣ୍ଡ ! ଆମାଦେର ବଲଲେ ତୋଦେର ନିମ୍ନେଇ ସତ ଅନର୍ଥ, ତୋରାଇ ଅଭିଧାନ ସେଟେ ବେର କର ସୁଡ଼ି ମାନେ କୀ, ଆମି ତତକଣେ ଏକଟୁ ସାଂତରେ ଆସି । ତାରପର ତିନି ସେଇ ଯେ ସୌତରାତେ ଗିଯେଛେନ ଏଥନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ନାମଟି ନେଇ ।'

ବାଦଶାହ ବଲଲେନ, 'ସତ ସବ ବାସନାକ୍ତା । ଆକେଲ ଆଲୀ ଦ୍ୟାକୋ ଦିକି କୀ ବ୍ୟାପାର !'

উজির সাগর পাড়ে গিয়ে দেখেন পশ্চিত রীতিমতো হ্যাবড়ুরু খাচেছেন। তিনি টেঁচিয়ে বললেন, 'এই বুঝি আপনার অভিধান হাঁটা?'

পশ্চিত হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে পাড়ে উঠে এসে বললেন, 'বুবালেন কিনা, বিদ্যা হলো সমুদ্রে, তাই একটু ঘেঁটে দেখছিলাম আর কি।'

উজির বললেন, 'তা পেলেন কিছু?'

পশ্চিত বললেন, 'গেলাম আর কই। বুড়ো মানুষ, আপনাদের মতো দেহও নেই, ক্ষমতায়ও কুলালো না। সুড়ি শব্দোটা একেবারে তলদেশে কি-না, ওটা খুঁজে আনা যাব-তার কম্ভো নয়।'

উজির কী বেল ভাবলেন। তার মনে হলো বাদশার জন্যে তিনি কী না করতে পারেন। বিদ্যাসমুদ্রের তলদেশ থেকে সুড়ি শব্দের অর্থ খুঁজে আনা তো সহজ কাজ। বরং বাহাদুরি দেখানোর এই এক সুযোগ। বাদশাহ নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

তিনি বললেন, 'কোথায় দেখিয়ে দিন।'

পশ্চিত বললেন, 'মাঝিদের বলুন, ওরা মাঝখানে গিয়ে ঠিক জায়গামতোই বুঝ করে নামিয়ে দেবে।'

উজির বললেন, 'ঠিক হ্যায়।'

জেলেনৌকার মাঝিরা তাদের ডিঙিতে করে সমুদ্রের একেবারে মাঝখানে গিয়ে চ্যাংদোলা করে উজির আকেল আলীকে বুঝ করে ছেড়ে দিল। উজির আকেল আলী সেই যে সমুদ্রের তলদেশে সুড়ির অর্থ আনতে গেলেন আর ফিরলেন না।

হেলেরা দল ঝেঁধে শাহিমহলের ময়দানে সুড়ি ওড়াতে ওড়াতে সুর ধরল—

উজির গেলেন রসাতলে

বাদশা গেলেন ঘরে

নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে

মাথা ঠুকে মরে।

চ্যাম কুড়কুড়, চ্যাম কুড়কুড়

তা ধিন ধিনতা ধিন

পদ্ম লেখার জোরেই কেবল

এল সুরের দিন।

লেখক-পরিচিতি

মাহমুদুল হকের জন্ম ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় চলে আসেন। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন ‘রেড হার্নেড’ নামে একটি রহস্য-উপন্যাস লিখে সাহিত্যে প্রবেশ করেন। পরবর্তীকালে ছাটোগাল্প ও উপন্যাসে কৃতিত্বের জ্ঞানের রাখেন। তাঁর লেখালেখির বিষয় দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ। ‘অনুর পাঠশালা’, ‘জীবন আমার বোন’, ‘কালো বরফ’ প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস। ‘চুরুর কাবুক’ তাঁর কিশোর-রচনা। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য মাহমুদুল হক বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

শহীদের আলীজান নামে এক বাদশাহ ছিলেন। দেশের আরও লোকের সঙ্গে নাম মিলে যাওয়ায় নিজের নামটিকে তিন শব্দ করে দিলেন তিনি। এতে বেজায় খুশি তার মোসাহেব উজির আকেল আলী। এরই মধ্যে বাদশাহ ও উজিরকে নিয়ে কারা যেন বিদ্রূপময় ভাষায় পদ্য লেখা শুরু করে। এতে বেশ শুরু হন বাদশাহ ও উজির। এরপর দেখা গেল, ঘূড়িতেও কারা যেন পদ্য লিখে রেখেছে। রাজা ঘূড়ি তৈরি ও ওড়ানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ছেলেরা তখন কলাপাতা গোল গোল করে কেটে বাতাসে ওড়ানো শুরু করল। তাতেও বাদশাহ আপত্তি করায় চটপটে এক ছেলে প্রতিবাদ করে বলল, এটা তো ঘূড়ি নয়—কলাপাতা মাত্র। বাদশাহ বললেন, যা ওড়ে তা-ই ঘূড়ি। এবার ছেলেটি পালটা প্রশ্ন করে, তাহলে পাখি, ধূলো, উড়োজাহাজ—এসবও ঘূড়ি, কিন্তু সেসব উড়তে নিষেধ করছেন না কেন? বাদশাহ পড়ে গেলেন মুশ্কিলে। তাই ‘ঘূড়ি’ বলতে আসলে কী বুঝায়, তা অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হলো পণ্ডিতকে। ছেলেদের কৌশলে পণ্ডিত পড়ল গিয়ে সমুদ্রে। আর বাদশাহকে খুশি করার জন্য সকল কাজের কাজি আকেল আলীও ঘূড়ির অর্থ খুঁজতে ‘বিদ্যাসমুদ্রে’ বাঁপ দিল—সেই যে ভুবল আর ভাসল না। ছেলেরা আবার আকাশে ঘূড়ি ওড়াবার সুযোগ পেল। সেটা সম্ভব হলো পদ্য লেখার জোরেই।

হাস্যরসের মাধ্যমে এই গল্পে দুষ্টলোকের স্বাভাবিক পতন এবং সাধারণ মানুষের অধিকার ও জয় তুলে ধরা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

সাঙ্গি	— প্রহরী, রক্ষী। যে পাহারা দেয়।
উজির	— মন্ত্রী।
নাজির	— আদালতের কর্মচারী।
পাত্র-মিত্র	— রাজসভার উজির বা মন্ত্রী।
সভাসদ	— রাজ-দরবারের লোক। সভায় যোগদানকারী ব্যক্তি।
দরবার	— সভা।
প্রাসাদ	— রাজভবন।
প্রাচীর	— দেয়াল।
হিজিবিজি	— আঁকাবাঁকা রেখাযুক্ত অল্পষষ্ঠ লেখা।
ঠাঁদি	— মাথার উপরিভাগ।

গীটা	— মুঠি করা আঙুলের জোরালো আঘাত।
শূল	— ধারালো সরু মুখ্যুক্ত কাঠ বা শোহ বিশেষ।
আর্জি	— নিরবেদন।
এন্টার	— যাবতীয়, সকল।
গাঞ্জীর্য	— গাঞ্জীর ভাব। চাপ্পাল্য না-দেখানো।
পেলাঘ	— বড়ো আকারের কোনো কিছু।
ফ্যাচোর ফ্যাচোর	— বিরাক্তিকর অদৃশকারি বাক্যপ্রয়োগ।
দশমুনে	— দশমণি-বিশিষ্ট।
বান্ডল	— আঁটি। ইংরেজি Bundle।
টানা হাঁচড়া	— টানাটানি করা।
অভিধান	— এক ধরনের বই। অর্থসহ শব্দকোষ।
বিদ্যাসমুদ্র	— জ্ঞানের সাগর।
বাহানুরি	— কৃতিত্ব বা সাহস্র্যে গৌরব করা।

କୋକିଳ

ହାଙ୍ଘ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଆନ୍ଦେରସେନ

ଅନୁବାଦ : ବୁନ୍ଦଦେବ ବସୁ



ଶୋମୋ ତବେ—

ଚିନ୍ଦେଶେର ରାଜା ଏକଜନ ଚିନ୍ଦେମ୍ୟାନ, ତା'ର ଆଗେ-ପିଛେ ଡାଇନେ-ବାରେ ଯତ ଲୋକ, ତାରାଓ ସବ ଚିନେ । ରାଜାର ଛିଲ ଏକ ଥାସାଦ, ଅମନ ଆର ପୃଥିବୀତେ ହୟ ନା । ବାଗାନେ ଫୋଟେ କତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଫୁଲ; ସବଚେଯେ ସେଣ୍ଠିଲୋ ଦାମି ତାଦେର ଗଲାଯ ଝନ୍ପେର ଘଣ୍ଟା ବାଧା, କାହୁ ଦିଯେ ଯଦି ହେଟେ ଯାଓ, ଘଟାର ଶକ୍ତେ ଫିରେ ତାକାତେଇ ହବେ । ବୁବାଲେ, ରାଜାର ବାଗାନେ ସବ ବ୍ୟବହାରୀ ଚମତ୍କାର । ଏତ ବଡ଼ୋ ବାଗାନ, ମାଲି ନିଜେଇ ଜାନେ ନା ତାର ଶୈଖ କୋଥାର । ଯଦି କେବଳଇ ହେଟେ ଚଲେ, ଆସବେ ଏକ ବନେର ଧାରେ । କୀ ସୁନ୍ଦର ବନ, ତାତେ ମଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଗାଛ ଆର ଗଭୀରତ୍ରିନ୍ । ବନ ଦୋଜା ସମୁଦ୍ରେ ଚଲେ ଗେଛେ, ନୀଳ ଜଳେର ଅତଳ ସମୁଦ୍ର ଆର ଝୁକୁ-ପଡ଼ା ଡାଲପାଲାର ଆଡ଼ାଲେ ଲୁକିଯେ ଥାକେ ଏକ କୋକିଳ । କୀ ମଧୁର ତାର ଗାନ, ଏତ ମଧୁର ଯେ ଜେଲେ ମାଛ ଧରତେ ଏସେ ହତେର କାଜ ଫେଲେ ଚୁପ୍ଚ କରେ ଶୋନେ, ସଥିନ ଶୈଖ ରାତେ ଜାଲ ଫେଲତେ ଆସେ ଶୋନେ କୋକିଲେର ସବ ।

নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে সেই রাজধানীতে, দেখে বাহবা দেয়। রাজার প্রাসাদ আর বাগান দেখে তাদের চোখের পলক আর পড়ে না; কিন্তু কোকিলের গান যেই তারা শোনে, অমনি বলে ওঠে, ‘আহা, এমন আর হয় না!’ দেশে ফিরে এসে তারা কোকিলের গন্ধ করে; পণ্ডিতেরা বড়ো-বড়ো পুঁথি লেখেন চীন রাজার প্রাসাদ নিয়ে, বাগান নিয়ে; কিন্তু কোকিলকে কি তাঁর ভুলতে পারেন? সেই পাখির প্রশংসা হাজার পাতা জুড়ে, আর কবিরা হৃদে-ঘেরা বনের বুকের সেই আশ্চর্য পাখিকে নিয়ে আশ্চর্য সব কবিতা লেখেন।

পুঁথিগুলো পৃথিবীতে কে না পড়ল! আর চীন রাজার হাতেও কয়েকখানা এসে পড়ল বইকি। তাঁর সোনার সিংহাসনে বসে-বসে তিনি পড়লেন, আরও পড়লেন, পড়তে পড়তে কেবলি খুশি হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন—কেবল তাঁর রাজধানীর, তাঁর প্রাসাদের, তাঁর বাগানের এতসব উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়ে বড়ো ভালো লাগল তাঁর। ‘কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোকিল পাখি’, সেখানে স্পষ্ট করে লেখা।

রাজা চমকে উঠলেন। কোকিল! সে কী জিনিস? ও-রকম বেনো পাখি আছে নাকি আমার রাজত্বে? আমার বাগানেও নাকি আছে! আমি তো কখনো শুনিনি! কী কান্ত, তার কথা আমি প্রথম জানলাম এসব বই পড়ে। রাজা তাঁর প্রধান অমাত্যকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এতই প্রধান যে তাঁর নিম্নজোড়ে যদি কখনো সাহস করে তাঁর সঙ্গে কথা বলত তিনি শুধু জবাব দিতেন: ‘পি! আর তার অবশ্য কেনো মানে হয় না।’

‘কোকিল বলে এক আশ্চর্য পাখি নাকি এখানে আছে!’, রাজা বললেন। ‘এঁরা বলছেন আমার এত বড়ো রাজত্বে সেটাই শ্রেষ্ঠ জিনিস। কই, আমি তো তার কথা কখনো শুনিনি!'

প্রধান অমাত্য একটু ভেবে বললেন, ‘রাজসভায় সে তো কখনো উপস্থিত হয়েন, তার তো নামই শুনিনি, মহারাজ।’

রাজা বললেন, ‘আজ সন্ধ্যায় সে আমার সভায় এসে গান করবে, এই আমার আদেশ। যদি সে না-আসে তাহলে আজ সাক্ষ্যতোজের পর আমার সমস্ত সভাসদ হাতির নিচে পড়ে মরবে।’

‘চুৎ-পি!’ প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন। তারপর আবার তিনি ওঠানামা করলেন দু-শো সিঁড়ি দিয়ে, খুঁজলেন সব ঘর, সব বারান্দা, আর সভাসদগু ছুটল তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে। হাতির নিচে পড়ে মরতে কাবুরই পছন্দ নয়।

শেষটায় রাজাঘরে ছোটো একটা মেয়ের সঙ্গে তাদের দেখা, রাজার পাঁচশো রাঁধুনির জন্য পাঁচশো ঝি, সেই বিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সে। সে বলল, ‘কোকিল? আমি তো রোজই শুনি তার গান— আহা, সত্যি বড়ো ভালো গায়।’

প্রধান অমাত্য গঞ্জিয়ানুখে বললেন, ‘আজ সন্ধ্যায় কোকিলের রাজসভায় আসবার কথা। তুমি পারবে আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে? যদি পারো, এক্ষুনি তোমাকে রাঁধুনি করে দেব, তা ছাড়া মহারাজ যখন তোজে বসবেন তুমি দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দেখবার অনুমতি পাবে।’

তখন তারা সবাই মিলে গেল সেই বনে, কোকিল যেখানে গান গায়; গেল মন্ত্রী, সেনাপতি, উজির, নাজির, হাকিম, পেশকার।

‘ওই তো! মেয়েটি বলল। ‘শুনুন আপনারা, শুনুন— ওই তো সে বসে আছে।’ মেয়েটি একটা গাছের ঘন ভালোর দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

ଅନେକକୁଣ୍ଠ ଉତ୍କିଳୁକି ଲାଫକ୍ଷାପ ମେରେ ଅନେକ ଚେଟୀଯ ସବାଇ ସେଇ କାଳେ ପାଖିକେ ଦେଖିତେ ପେଲ । ପ୍ରଧାନ ଅମାତ୍ୟ ବଲେ ଉଠିଲେନ, 'ଆରେ ଏ ଆବାର ଏକଟା ପାଖି ନାକି । ମରି ଯାରି, କୀ ବୂପ !'

ସମ୍ଭବ ଦଳ ଏହି ରସିକତାଯ ହେସେ ଉଠିଲ ।

ଯେମୋଟି ଗଲା ଚଢ଼ିଲେ ବଲଲ, 'କୋକିଲ, ଶୁଣଛ ? ଆମାଦେର ସ୍ମାର୍ଟ ତୋମାର ଗାନ ଶୋନବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେଛେ ।'

'ନିଶ୍ଚୟାଇ, ନିଶ୍ଚୟାଇ ।' କୋକିଲ ତଙ୍କୁନି ମହା ଉତ୍ସାହେ ଗାନ ଗାଇତେ ଆରମ୍ଭ କରଲ ।

କୋକିଲ ଭେବେହିଲ ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଝି ଶେଖାନେ ଉପଛିତ । ପ୍ରଧାନ ଅମାତ୍ୟ ଗଣ୍ଡିର ସ୍ଵରେ ବଲଲେନ, 'ବେଶ ଗାନ ତୋମାର, କୋକିଲ । ଆଜ ରାଜପ୍ରାସାଦେର ସାନ୍ଦ୍ରୁଟୁର୍ବେ ତୋମାକେ ଆମି ନିମତ୍ରଣ କରାଇ, ଶେଖାନେ ତୁମି ଗାନ ଶୁଣିଯେ ଆମାଦେର ସ୍ମାର୍ଟକେ ମୁହଁ କରବେ ।'

ରାଜସଭାଯ ଆଜ ଉତ୍ସବ-ସଜ୍ଜା ।

ସଭାର ଠିକ ମାବାଖାନେ ସୋନାର ଏକଟା ଡାଲେ ହୀରେର ପାତା ବସାନୋ, କୋକିଲ ଶେଖାନେ ବସବେ ।

ସଭାସଦରୀ ବସେଛେନ ଶାଜେର ଆର ଅଲଂକାରେ ଯିଲିକ ତୁଳେ, ଆର ସେଇ ଛୋଟୋ ଯେମୋଟି ଦରଜାର ଆଡ଼ଲେ— ଦେ ଏଥିନ ରାଜ-ବ୍ୟାଧିନିର ପଦ ପୋଯେଛେ । ସବାଇ କୋକିଲେର ଦିକେ ତାକିଯେ; ସ୍ଵୟାଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଚୋଥେର ଇଶାରାଯ ତାକେ ଉତ୍ସାହ ଦିଚେଛନ ।

ଆର କୋକିଲ ଏମନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗାନ କରଲ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟେର ଦୁଇ ଚୋଥ ଜଲେ ଭରେ ଉଠିଲ, ଚୋଥ ଛାପିଯେ ବେଶେ ପଡ଼ିଲ ଗାଲ ଦିଯେ; ତଥବା କୋକିଲ ଗାଇଲ ଆରଓ ମଧୁର, ଆରଓ ତୀତ୍ର ମଧୁର ସ୍ଵରେ, ତା ସୋଜା ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଏସେ ଲାଗଲ । ସ୍ମାର୍ଟ ଏତ ଖୁଶି ହଲେନ ଯେ ତିନି ତାକେ ତାର ଏକପାଟି ସୋନାର ଚଟି ଗଲାଯ ପରବାର ଜନ୍ୟେ ଦିତେ ଚାଇଲେନ । କିନ୍ତୁ କୋକିଲ ବଲଲ, 'ମହାରାଜ, ଆମାକେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମି ଆର କିନ୍ତୁ ନିତେ ପାରିବ ନା, ସ୍ଵେଚ୍ଛା ପୂରକାର ଆମି ପେଯେଛି । ଆମି ସ୍ମାର୍ଟେର ଚୋଥେ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖେଛି— ସେଇ ତୋ ଆମାର ପରମ ଐଶ୍ୱର । ସ୍ମାର୍ଟେର ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ଯୁତ କ୍ଷମତା— ଏତ ବଡ଼ୋ ପୂରକାର ଆର କୀ ଆଛେ ।'

ତଥବା ଥେକେ ରାଜସଭାତେଇ ତାର ବାସା ହଲୋ, ନିଜେର ସୋନାର ବୀଚାର । ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ଦୁଃଖାର ମେବେରେ ପାରେ, ଆର ରାତ୍ରେ ଏକବାର । ଆର ତାର ବେରୋବାର ସମୟ ସଙ୍ଗେ ଥାକେ ବାରୋଜନ ଚାକର, ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକର ହାତେ ପାଖିର ପାଯେର ସଙ୍ଗେ ବାଁଧା ରେଖି ଶୁତୋ ଶକ୍ତ କରେ ଧରା । ଏ ରକମ ବେଡ଼ାନୋଯ କୋନୋ ସୁଖ ନେଇ, ସତ୍ୟ ବଣତେ ।

ଏକଦିନ ରାଜାର ନାମେ ଏଲ ମନ୍ତ୍ର ଏକଟା ପାର୍ମେଲ, ତାର ଗାୟେ ବଡ଼ୋ-ବଡ଼ୋ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖା, 'କୋକିଲ ।'

'ଏହି ବିଖ୍ୟାତ ପାଖି ସମ୍ବନ୍ଧେ ନତୁନ ଏକଟା ବଇ ଏଲ', ରାଜା ବଲଲେନ ।

କିନ୍ତୁ ବଇ ତୋ ନୟ, ବାଜ୍ରେର ମଧ୍ୟେ ଛୋଟୋ ଏକଟା ଜିନିସ । ଚମଞ୍କାର କାଜ କରା ଏକଟା କଲେର କୋକିଲ, ମଣି ମୁକ୍ତୋ ହୀରେ ଜହରତେ ଝଲାମଲୋ, ସତ୍ୟକାରେର ପାଖିର ମତୋ ତାର ଗାନ । କଲେର ପାଖିଟାଯ ଦମ ଦିଯେଛ କି ସେ ଅବିକଳ କୋକିଲେର ମତୋ ଗାଇତେ ଶୁକ୍ର କରବେ, ଆର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଲବେ ତାର ସୋନା-ଙ୍କପୋର କାଜ-କରା ଶେଜ । ଗଲାଯ ତାର ଛୋଟ ଫିଲେ ବାଁଧା, ତାତେ ଲେଖା : 'ଜାଗାନେର ମହାମହିମାଦ୍ଵିତ ସ୍ମାର୍ଟେର କୋକିଲେର ତୁଳନାଯ ଚିନ ସ୍ମାର୍ଟେର କୋକିଲ କିନ୍ତୁ ନୟ ।'

'এখন এরা দুজন একসঙ্গে গান করুক', রাজা বললেন। 'সে কী চমৎকারই হবে!'

দু-জনে একসঙ্গে গাইল, কিন্তু বেশি জমল না। কারণ কলের কোকিল গাইল বাঁধা গৎ, আর সত্যিকারের কোকিল গাইল নিজের খেয়ালে।

কোকিলবাহক বলল, 'আমাদের কোকিলের কিছু দোষ নয়; ও বাঁধা সুরে গায়— একেবারে নির্খুত।'

তারপর কলের কোকিল একা গাইল। আসল কোকিলেরই মতো সে মুক্ষ করল— তার উপর সে দেখতে অনেক ভালো, বাঞ্ছবন্ধহারের মতো শুলমল করছে।

একবার নয়, দুবার নয়, বাঞ্ছবার কলের কোকিল সেই একই গৎ গাইল, তবু ঝাঁপ্ত হলো না। অমাত্যদের আবার শুনতেও আপত্তি নেই, কিন্তু স্মাট বললেন, 'এখন জ্যান্ত কোকিল কিছু গান করুক।'

কিন্তু কোথায় সে?

কখন সে উড়ে গেছে খোলা জানালা দিয়ে, ফিরে গেছে বনের সবুজ বুকে, কেউ লক্ষ করেনি।

তারপর অবশ্য কাণের কোকিলকে আবার গাইতে হলো, চৌঙ্গিশবারের বার একই গৎ তারা শুলল। পরের পূর্ণিমায় রাজোর সব প্রজাকে নিমত্রণ করা হলো এই পাথি দেখতে— সংগীতবিশারদ দেখাবেন। গানও শুনতে হবে তাদের, রাজার হৃকুম। গান তারা শুল— একবার নয়, দু-বার নয়, ছাঞ্ছিশবার। এত ঝুশি হলো তারা গান শুনে, যেন ছাঞ্ছিশ পেয়ালা চা খেয়েছে। কেউ বলল আহা, কেউ বলল ওহো; কেউ ঘাড় নাড়ল, কেউ নাড়ল মাথা; কিন্তু সেই যে জেলে, বনের মধ্যে আসল কোকিলের গান যে শুনেছিল, সে বলল, 'মন্দ নয়, কিন্তু যতবার গাইল এক রুকমই লাগল যেন। আর কী-যেন একটা নেই মনে হলো।'

কথাটা সংগীতবিশারদ শুনে হেসেলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী নেই বলো তো বাপু? তালে লয়ে সুরে মানে একেবারে নির্খুত।'

জেলে বেচারা ঘাবড়ে চুপ করে গেল। আসল কোকিল নির্বাসিত হলো দেশ থেকে। নকল পাখিটা রাইল রাজার হালে; স্মাটের বিছানার পাশে রেশমি বালিশে সে ঘুমোয়, চারদিকে মণিমুক্তো হীরে-জহরতের সব উপটোকল ছড়ানো।

সংগীতবিশারদ এই নকল পাথি সম্বন্ধে পঁচিশখানা মোটা-মোটা পুঁথি লিখে ফেললেন— তাঁর লেখা যেমন লম্বা তেমনি শুক্-গঞ্জির, চীনে ভাষার যত শক্ত-শক্ত কথা সব আছে তাতে— তবু সবাই বলল যে তারা সবটা পড়েছে এবং পড়ে বুঝেছে, পাছে কেউ বোকা ভাবে, কি সংগীতবিশারদ চটে গিয়ে পাগলা হাতির নিচে তাদের থেতেলে মারেন।

কাটল এক বছর এমনি করে। কলের পাথির গানের প্রতিটি ছোটো-ছোটো টান স্মাটের মুখ্য, তাঁর পারিষদদের মুখ্য, অত্যোক চীনের মুখ্য।

এরই মধ্যে একদিন হলো কী— কলের পাথি গেয়ে চলছে, এত ভালো সে আর কখনোই যেন পায়নি— স্মাট শুনছেন বিছানায় শুয়ে। হঠাৎ পাখিটার ভেতরে একটা শব্দ হলো, 'গৱৰৱৰ', কী যে একটা ছিঁড়ে গেল 'গী-গী— গৱৰৱৰ' সবগুলো চাকা একবার ঘুরে এল, তারপর গান গেল থেমে।

সন্দ্রাট লাখিয়ে উঠলেন, ঢেকে পাঠালেন তাঁর দেহ-পুরোহিতকে (চীন সন্দ্রাটের চিকিৎসকের তা-ই উপাধি); কিন্তু তিনি কী করবেন? তারপর ডাকা হলো ঘড়িওয়ালাকে— অনেক বলাবলি, অনেক ঝোজাঝুজি, টুকটাক ঠুক্ঠাকের পর পাখিটাকে কোনোরকম মেরামত করা গেল বটে; কিন্তু আগের জিনিস আর হলো না। ঘড়িওয়ালা বলে গেল একে যেন খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা হয়, কলকবজা গেছে খারাপ হয়ে, নতুন আর বসানো যাবে না। এরপর থেকে বছরে একবারের বেশি একে গোওয়ানো যাবে না, আর তাও না-গোওয়ালেই ভালো। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

পাঁচ বছর কেটে গেল— এবার রাজ্যে সত্ত্বিকারের হাহাকার। চীনেরা তাদের সন্দ্রাটকে সত্ত্বি ভালোবাসে, আর এখন শোনা যাচ্ছে সন্দ্রাটের নাকি অসুখ, আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। এরই মধ্যে নতুন একজন সন্দ্রাট ঠিক করা হয়ে গেছে; আর প্রজারা রাজপ্রাসাদের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রধান অমাত্যর কাছে খোঁজ নিচ্ছে রাজা কেমন আছেন।

প্রধান অমাত্য বলছে, ‘গী! আর মাথা নাড়ছেন।

মন্ত্র জমকালো বিছানায় সন্দ্রাট শয়ে আছেন— শরীর তাঁর ঠাড়া, মুখ তাঁর স্নান। সভাসদদের ধারণা তিনি মরে গেছেন— তাঁরা ছুটেছেন নতুন সন্দ্রাটকে অভিনন্দন জানাতে।

কিন্তু সন্দ্রাট মরেননি; শক্ত, নিঃসাড় হয়ে শয়ে আছেন জমকালো বিছানায়। ঘরের জানালা খোলা, আকাশ থেকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সন্দ্রাটের ওপর আর তাঁর কলের পাথির ওপর।

অতি কষ্টে সন্দ্রাটের নিশ্চাস পড়ছে, কেউ যেন চেপে বসেছে তাঁর বুকের ওপর। চোখ মেলে তিনি তাকালেন; দেখলেন তাঁর বুকের ওপর মৃত্যু বসে, তার মাথায় তাঁরই সোনার মুকুট, এক হাতে তাঁরই তরোয়াল, অন্য হাতে তাঁরই বাকবাকে নিশান। এখন মৃত্যু কিনা তাঁর বুকের ওপর বসে!

‘গান! গান! সন্দ্রাট বলে উঠলেন।

কিন্তু পাখিটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল— কে দেবে তাকে দম, আর দম না-দিয়ে দিলে সে গাইবেই-বা কী করে? আর হাঁচাঁ জানালার দিক থেকে বেজে উঠল গান, আশ্চর্য মধুর গান। এ সেই ছেট কোকিল, আসল কোকিল, জানালার বাইরে গাছের ডালে বসে সে গাইছে। সে শুনেছিল সন্দ্রাট ভালো নেই, আর তাই সে এসেছে তাঁকে শান্তি দিতে, আশা দিতে। গেয়ে চশ্চল সে একমনে, রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে জোরে বইল সন্দ্রাটের দুর্বল শরীরে; এমনকি মৃত্যুও কান পেতে শুনল, তারপর বলল :

‘আহা— থেমো না, বাছা, থেমো না!'

‘তবে আমাকে দাও ওই বাকবাকে সোনালি তরোয়াল, দাও ওই চোখ-ঝলসানো নিশান, দাও ওই সন্দ্রাটের মুকুট।’

আর মৃত্যু একে-একে সব ঐশ্বর্য দিয়ে দিল, গান শুনবে বলে। কেকিলের গান আর থামে না।

রাজা বলে উঠলেন, ‘ধন্য কোকিল, তুমি ধন্য! ওরে দেবতার দৃত বর্গের পাথি, তোকে তো আমি চিনি! তোকেই না আমি আমার রাজত্ব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম! তবু তুই-ই তো আজ তাড়িয়ে দিলি মৃত্যুকে আমার দ্বন্দ্য থেকে! কী পুরস্কার চাস তুই বল।’

কোকিল বলল, 'আমি, তো পেয়েছি আমার পুরস্কার। মহারাজ, প্রথম যেদিন আমি আপনার সামনে গান করি, আপনার চোখে জল এসেছিল। তা আমি কখনো ভুলব না। যে গান গায়, ওর বেশি আর কোন মণিমুভো চায় নে? এখন আপনি ঘুমোন, মহারাজ, সুষ্ঠু সবল হয়ে উঠলেন, আর আমি আপনাকে গান শোনাই।'

গাইল কোকিল, শুনতে শুনতে সন্দাট ঘুমিরে পড়লেন। সে-ঘূম ঘুচিয়ে দিল তাঁর সকল রোগ, সকল ক্লান্তি। সকালবেলার আলো জানালা দিয়ে তাঁর মুখের ওপর এসে পড়ল; তিনি জেগে উঠলেন—নতুন স্বাস্থ্য, নতুন উৎসাহ নিয়ে। অমাত্য কি ভৃত্য কেউ তখনও আসেনি, সবাই জানে তিনি আর বেঁচে নেই। কেবল কোকিল তখনও গান করছে তাঁর পাশে বসে।

'তুমি সবসময় থাকবে আমার সঙ্গে— থাকবে তো?' সন্দাট বললেন। 'তোমার যেমন খুশি গান করবে তুমি। কলের পুতুলটাকে হাজার টুকরো করে আমি ভেঙে ফেলব।'

কোকিল বলল, 'মহারাজ, যিছিমিছি ওর ওপর রাগ করছেন। যতখানি ওর সাধ্য ও করেছে; এতদিন শুকে রেখেছেন, এখনও রাখুন। আমি তো রাজপ্রাসাদে বাসা বেঁধে থাকতে পারব না; অনুমতি করুন, যখন ইচ্ছে করবে আমি আসব, এসে সঙ্কেবেলায় জানালার ধারে ওই ডালের ওপর বসে গান শোনাব আপনাকে— সে গান শুনে অনেক কথা আপনার মনে পড়বে। যারা সুবী তাদের গান গাইব, যারা দৃঢ়বী তাদের গান গাইব; গাইব চারদিকে লুকোনো ভালো-মন্দের গান। আপনার এই ছাটো পাখিটি অনেক দূরে-দূরে ঘুরে বেড়ায়, গরিব জেলের ঘরে, চাষিদের ঘেতে— আপনার সভার ঐশ্বর্য থেকে অনেক দূরে যাবা থাকে, যাব তাদের কাছে, জানে তাদের কথা। আপনাকে আমি গান শোনাব এসে; কিন্তু মহারাজ, একটি কথা আমাকে দিতে হবে।'

'যা চাও! যা কিছু চাও তুমি!' সন্দাট নিজের হাতেই তাঁর রাজবেশ পরে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সোনার তরোয়াল চেপে ধরলেন বুকের ওপর।

'এই যিনতি আমার, ছাটো একটা পাখি এসে আপনাকে সব কথা বলে যায় এ-কথা কাউকে বলবেন না। তাহলেই সব ভালো রকম চলবে।'

এল ভৃত্য, এল অমাত্য মৃত সন্দাটকে দেখতে। এ কী! ওই তো তিনি দাঁড়িয়ে! সন্দাট তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো।'

লেখক-পরিচিতি

হাল ক্রিশ্চিয়ান আন্দেরসেনের জন্ম ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের আন্দেনস শহরে। বাবা ছিলেন জুতার কারিগর ও নেহাত গরিব লোক। নানা বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সাহিত্যিক হিসেবে আন্দেরসেন লাভ করেন জগতজোড়া খ্যাতি। তিনি নাটক, ভ্রমণকাহিনি ও উপন্যাস লিখলেও সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছেন গল্প লিখে। আন্দেরসেনকে বলা হয় গল্পের জানুকর। কল্পনা ও বাস্তবের মিশেলে রচিত হয়েছে এসব গল্পকথা। এতে মানবিক অনুভূতি গভীরভাবে ঝুটে উঠেছে। তাঁর জ্ঞানকথাগুলো ১২৫টিরও বেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় আন্দেরসেনের অনেক গল্প অনুদিত হয়েছে। 'মন্দ্রস্যাকল্যা', 'কুচিহত প্যাঁকারু', 'বুনো ইঁসদের কথা' 'নাইটিজেল', 'রাজার নতুন গোশাক' প্রভৃতি গল্প ঘরে ঘরে পরিচিত ও জনপ্রিয়। আন্দেরসেন ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে কোপেনহেগেনে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক-পরিচিতি

বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, অনুবাদক ও সম্পাদক ছিলেন। ‘প্রগতি’ ও ‘কবিতা’ পত্রিকা সম্পাদনা করে বিশেষ খ্যাতি পান। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে—‘বন্দীর বন্দনা’, ‘কঙ্কারতী’, ইত্যাদি কাব্য। ‘তিথিডোর’, ‘নির্জন স্বাক্ষর’, ‘বাত ভ’রে বৃষ্টি’ ইত্যাদি উপন্যাস। মহাকবি কালিদাসের ‘মেঘদূত’ তাঁর অনুবাদ-এছ। বুদ্ধদেব বসু ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

এটি একটি ঝুগ্নকথাধর্মী গান। চীনদেশে ছিল এক ছোট ও সুকৃষ্টি কোকিল। একদিন রাজসন্দরবারে ডাক পড়ল তার। রাজা কোকিলের গানে মুক্ষ হয়ে তাকে রেখে দিলেন রাজসভাতেই, সোনার ঝাঁচায় পুরে। এবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী হলো এক কলের কোকিল। গৃহ্ণার্থ তার কষ্ট ও সুর। তবু সবাই তার প্রশংসায় পদ্ধতিমূখ্য কলের কোকিলের প্রশংসায় অবহেলিত আসল কোকিল একদিন রাজসাদ ত্যাগ করল। এরই মধ্যে কলের কোকিলের তার ছিঁড়ে গেল। তাকে মেরামত করা হলো বটে, তবে আগের মতো আর টানা বাজে না। রাজ্য পড়ে গেল হাহাকার। রাজা ও হলেন বেজায় অসুস্থ, পড়ে রাইলেন বিছানায় নিথর। কিন্তু রাজা মারা যাননি, তবে মৃত্যুভীতি তার বুকে চেপে বসেছে। আর মুমুর্খ রাজা কলের কোকিলের উদ্দেশে বলছেন, গান গাও, গান! কিন্তু কলের কোকিল চৃপ, কঢ়ে তার গান নেই। ঠিক সে সময় জানালার বাইরে গান গেয়ে উঠল ছোট সেই কোকিল, অপূর্ব সে সুর। গান তার আর থামে না। রাজ্যের এই দুর্দিনে রাজার থাগ রক্ষা করতে সে এসেছে ফিরে। সারারাত মধ্যে গান গেয়ে রাজাকে ঘূর্ম পাড়াল কোকিল। সকালে রাজা জেগে উঠলেন—পেলেন নতুন জীবন, নতুন উৎসাহ। বিনিময়ে কোকিল কিছুই নিল না কৃতজ্ঞ রাজার কাছ থেকে। শুধু স্বাধীনভাবে রাজা, অজা, জেলে, চারি সকলের জন্য দুঃখ-সুখের গান গাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল আর সবার অগোচরে রাজাকে জানাতে চাইল রাজ্যের সত্যিকার সকল থবর।

আসলে যে সত্যিকার উপকারী, সে কিছু পাওয়ার আশায় উপকার করে না। অন্যদিকে যত্রের চাকচিক্য সবসময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিকল্প হয় না। গল্পটিতে এসব সত্যের প্রকাশ ঘটেছে।

শব্দার্থ ও টাকা

চীনেয়ান	— চীনদেশীয় লোক।
হৃদ	— চারদিকে ছুল দিয়ে ঘেরা জলাশয়।
অতল	— যার তল নেই।
রাজধানী	— দেশশাসনের কেন্দ্র, যেখানে প্রধান প্রধান সরকারি অফিস থাকে।
প্রাসাদ	— ইমারত, বাড়ি।
অমাত্য	— আমলা, মন্ত্রী। রাজকর্মে মন্ত্রণালাতা ব্যক্তি।
নিম্ন	— নিচের।
সাঙ্ক্ষয়ভোজ	— সঙ্ক্ষয়কালের খাবারের আঝোজন।
সভাসদ	— সভায় যোগদানকারী ব্যক্তি। দরবারের লোক। রাজ-আমলা বা মন্ত্রী।

উজির	— মন্ত্রী।
নাজির	— আদালতের কর্মচারী, যিনি পেয়াদাদের দেখাশোনা করেন।
পেশকার	— আদালতের কর্মচারী, যিনি বিচারকের কাছে কাগজপত্র উপস্থাপন করেন।
রাজ-রাঁধনি	— উপাধি বিশেষ। রাজকীয় রান্নার কাজে নিযুক্ত প্রধান পাচক।
পার্সেল	— ঘোড়ক বা প্যাকেট।
স্ট্যাং	— নিজে, আপনি।
সোনার চাটি	— সোনার তৈরি পাতলা স্যান্ডেল বিশেষ।
ঐশ্বর্য	— সম্পদ।
মহামহিমাষিত	— অতিশয় গৌরবাপ্তি।
কোকিলবাহক	— কোকিল বহনকারী। যে কোকিলকে বহন করে।
বাঞ্ছবকহার	— একবরনের অলংকার। বাহতে পরার অলংকার বিশেষ।
গৎ	— গানের নির্ধারিত বা বীধা সুর।
সংগীতবিশারদ	— সংগীতজ্ঞ। গান-বাজনা বা বাদ্যযন্ত্রের সুর, তাল, লয়, ধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান রাখেন যিনি।
নির্বাসিত	— নিজের দেশ থেকে বহিস্থিত।
উপটোকন	— উপহার।
পারিষদ	— সদস্য, সভ্য, সভাসদ।
কঙ্কজা	— ফলপাতি।
নিঃসাড়	— অচেতন।
নিশান	— পতাকা।

কিং লিয়ার

উইলিয়াম শেক্সপিয়র

বুন্দান্ত : জাহানারা ইমাম



ব্রিটেনের রাজা লিয়ার বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি ছির করেছেন, তাঁর রাজ্য তিন ভাগে ভাগ করে তিন মেয়েকে দান করবেন। বড়ো দুই মেয়ে গনেরিল ও রিগানের বিয়ে হয়েছে আলবেনির ডিউক ও কর্নওয়ালের ডিউকের সঙ্গে। ছোটো মেয়ে কডেলিয়া এখনো কুমারী। ফালের রাজকুমার এবং বার্গান্ডির ডিউক—এই দুজনই কডেলিয়ার পাণিধারী হয়ে ব্রিটেনে এসেছে। রাজা লিয়ার তাঁর রাজদরবারে আজ সবাইকে ডেকেছেন। তিন মেয়ে, দুই জামাই, কডেলিয়ার দুই পাণিধারী, গুস্টারের আর্চ, কেন্টের আর্চ এবং আরো অনেকে উপস্থিত হয়েছেন রাজা কী বলেন, তা শোনার জন্য।

রাজা সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য-শাসনের বাকি-বামেলা আমার ভালো গাগে না। আমার কন্যা-জামাতাদের ওপর এই ভার ছেড়ে দিয়ে আমি শান্তিতে শেষদিনের প্রতীক্ষায় থাকতে চাই। এখন আমি

আমার কন্যাদের মুখ থেকে শুনতে চাই, আমাকে কে কতখানি ভালোবাসে। গনেরিল, তুমি আমার বড়ো মেয়ে, তুমিই প্রথমে বলো।' গনেরিল বলল, 'পিতা, আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা আমি কথায় প্রকাশ করতে অক্ষম। এই পৃথিবীতে যা কিছু মহান, সুন্দর, জীবনের যা কিছু কাম্য, আরাধ্য সবকিছুর চেয়ে, আমার এই দুই চোখের জ্যোতির চেয়ে, আমার সমগ্র জীবনের চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসি।'

বড়ো বোনের কথা শুনে কড়েলিয়া মনে মনে বলল, কড়েলিয়া তুমি তা হলে কী করবে? তুমি তো অমন করে ভালোবাসার কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে না। ভালোবেসে নীরবেই থেকে তুমি। গনেরিলের কথা শুনে রাজা খুব সজ্ঞোব প্রকাশ করে তাকে রাজ্যের সেঁরা এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন। তারপর মেজো মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার তুমি কী বলো?' রিগান বলল, 'আমার বড়ো বোন দেখি আমারই মনের কথাগুলো সব বলে দিয়েছে। তবে একটা কথা সে বলতে পারেনি, তা হলো আপনার ভালোবাসা ছাড়া আমার জীবনের অন্যসব সুখ-আনন্দ তুচ্ছ।' শুনে কড়েলিয়া আরেকবার মনে মনে হায় হায় করল, বেচারি কড়েলিয়া। তুমি তো ওদের মতো মুখ ফুটে বলতে পারবে না! কিন্তু তাই বলে তোমার ভালোবাসা কারো চেয়ে কম নয়; বরং তা এত গভীর যে জিতের উগায় আনলে তার মর্যাদাহানি হবে।

রাজা রিগানের প্রশংস্তি শুনে পরম হষ্টিত্বে তাকে রাজ্যের অপর এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন। এবার কড়েলিয়ার পালা। রাজা লিয়ার তিনি মেয়ের মধ্যে কড়েলিয়াকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। কড়েলিয়া যেন তাঁর চোখের মণি। কিন্তু এখন কড়েলিয়া যা বলল, তা শুনে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। কড়েলিয়া বলল, 'পিতা, আমার মনের কথা মুখে আনতে পারছি না। তার জন্য আমার অশান্তির সীমা নেই। একটি মেয়ের তার পিতাকে যতখানি ভালোবাসা কর্তব্য, ঠিক ততখানিই আপনাকে ভালোবাসি। তার বেশিও নয়, কমও নয়।'

অপমানে রাজা লিয়ারের মুখ কালো হয়ে গেল, তিনি বললেন, 'কথাটা স্মৃতিয়ে নাও কড়েলিয়া, নইলে তোমারই ক্ষতি।'

কী বলব পিতা! আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, লালন করেছেন, ভালোবেসেছেন। প্রতিদানে আমি আপনাকে ভালোবাসি, মান্য করি, সম্মান করি।

আমার বোনেরা যে বলেছে তাদের সবচেয়ে ভালোবাসা আপনাকেই দিয়েছে, তা হলে তাদের স্বামীদের জন্য কী রেখেছে? আমার বিয়ে হলে আমার স্বামীকেও তো আমি ভালোবাসব। তখন কি পিতার প্রতি কন্যার ভালোবাসা ও কর্তব্য ভাগ হয়ে যাবে না? সেটাই তো স্বাভাবিক। অতএব বোনদের মতো করে আমি বলতে পারব না।

রাজা লিয়ার অপমানে, ক্রোধে অস্ত্রির হয়ে বললেন, 'তুমি সত্যি সত্যি সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, পিতা, সত্যি সত্যি।'

'এত কম তোমার বয়স, এখনই এমন কঠিন তোমার মন?'

'বয়স আমার কম বটে, তবে যা সত্য, তা-ই বলছি।'

ক্রোধে, অপমানে, দুঃখে রাজার মুখ থমথম করতে লাগল, তিনি ভয়ংকর ঘরে বললেন, 'তুমি তাহলে তোমার সত্য নিরেই থাকো। এই মুহূর্তে আমি তোমাকে ত্যাজ্যকন্যা করলাম। আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও। আমিও তোমার কেউ নই। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও তুমি।'

ବିଷମ କ୍ରେଦିତ ରାଜୀ ତା'ର ରାଜ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ— ଯେଟା କର୍ତ୍ତେଲିଆର ଜନ୍ୟ ରେଖେଛିଲେନ, ସେଟା ବଡ଼ୋ ଦୁଇ ମେଯେକେ ଭାଗ କରେ ଦିଲେନ । ତିନି ଶୁଦ୍ଧ ରାଜୀ ନାମଟା ନିଜେର ଜନ୍ୟ ରାଖିଲେନ, କିନ୍ତୁ ରାଜୀ ଶାସନେର ଯାବତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଇ ଜାମାତର ଓପର ନ୍ୟାନ୍ତ କରିଲେନ । ତିନି ବଲିଲେନ, ଏଥିନ ଥେବେ ତିନି ମାତ୍ର ଏକ ଶତ ଜନ ଯୋଦ୍ଧାରଙ୍କୀ ମେଂଜେ ରାଖିବେନ । ଏବଂ ପାଲାକ୍ରମେ ଏକ ମାସ କରେ ଗନେରିଲ ଓ ରିଗାନେର କାହେ ବାସ କରିବେନ ।

ସେ ବିଷୟଟା ଆନନ୍ଦୋଧସବେର ଡିତର ଦିଯେ ଶୁରୁ ହେଯେଛିଲ, ତାର ଏରକମ ଭୟାବହ ପରିପତି ଦେଖେ ରାଜୀ ଲିଯାରେ ସଭାସଦବର୍ଗ ସକଳେ ବିପ୍ରିତ, ହତଚକିତ ହେବେ ଗେଲେନ । କର୍ତ୍ତେଲିଆର ଜନ୍ୟ ଦୁଃଖେ ତାରା ମୁହଁମାନ ହଲେଓ ଭୟେ କେଉଁ ରାଜୀର ସାମନେ କୋନୋ ଅତିବାଦ କରିତେ ପାରିଲେନ ନା । ଭୟ ପେଲ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଆର୍ଲ ଅବ କେନ୍ଟ । ରାଜୀର ସଭାସଦବର୍ଗେର ମଧ୍ୟେ କେନ୍ଟଇ ସରଚେଯେ ବିଶ୍ଵତ । ଲିଯାରେ ପ୍ରତି ତାର ଅଗାଧ ଭକ୍ତି । ଲିଯାର ତାର କାହେ ପିତୃତ୍ତମ୍ । ସେ ନିଭୀକ କହେ, କର୍ତ୍ତେଲିଆର ପ୍ରତି ରାଜୀର ଏହି ଅବିଚାରେର ଅତିବାଦ କରିଲ, ‘ଏ ଆପଣି କୀ କରିଛେନ ରାଜୀ? କର୍ତ୍ତେଲିଆ ସେ ଆପନାକେ କମ ଭାଲୋବାସେ ନା, ସେଟା କି ବୁବାତେ ପାରିଛେ ନା? ଅନ୍ତେସାରଶୂନ୍ୟ ତୋଷାମୋଦବାକ୍ୟଇ ଆପନାର କାହେ ବେଶି ମୂଳ୍ୟ ପେଲ?’

ରାଜୀ କ୍ରୁଦ୍ଧ କହେ ବଲିଲେନ, ‘ସଦି ବାଚତେ ଚାଓ, ତାହଲେ ଚପ ଥାକୋ ।’

‘ଆମାର ଏ ଜୀବନ ଆପନାର ସେବାତେଇ ଉତସର୍ଗ କରା । ଆପଣି ତା ନିଲେ ନିଯେ ନେବେନ । ଆମାର ଭୟ କୀମେର?’

ରାଜୀ କିଞ୍ଚିତ ହେବେ ତଥାନଇ କେଟେକେ ନିର୍ବାସନ-ଦସ ଦିଲେନ । ଛୟ ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ତାକେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛେଢ଼ ଚଲେ ଯେତେ ହବେ । କର୍ତ୍ତେଲିଆ ଏଥିନ କପର୍ଦକଶୂନ୍ୟ, ନିରାଶ୍ରାବ । ଏହି ଅବଜ୍ଞାଯ ବାର୍ଗାନ୍ତିର ଡିଉକ ତାକେ ବିବାହ କରିତେ ଚାଇଲ ନା । କାରଣ, ରାଜ୍ୟର ହାତାକୁ ରାଜକନ୍ୟାର କୋନୋ ମୂଳ୍ୟ ନେଇ ତାର କାହେ । ଫାଲେର ଯୁବରାଜ କିନ୍ତୁ ରାଜୀର ମେଂହ ଏବଂ ତାର ରାଜ୍ୟର ଥେକେ ବଧିତ କର୍ତ୍ତେଲିଆକେ କ୍ରି ହିସାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବଲେ ଜାନାଲ । କାରଣ, ସେ ବୁବୋ ଗେଛେ, କର୍ତ୍ତେଲିଆ ରମଣୀକୁଳେ ରତ୍ନଅଳପ । ସେ ଦ୍ୱାର୍ଥସାଧନେର ଜନ୍ୟ ତୋଷାମୋଦେର ବାକ୍ୟ ସାଜିଯେ କାଉକେ ଖୁଶି କରିତେ ପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତରେ ଅଞ୍ଜଳିତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, କର୍ତ୍ତ୍ୟଜାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସେ ସଚେତନ, ସଥ । ଏ ରକମ ରମଣୀକେ କ୍ରି ହିସାବେ ପାଞ୍ଚମୀ ଭାଗ୍ୟର କଥା । ସେ କର୍ତ୍ତେଲିଆକେ ବଲିଲ, ‘ଆମି ତୋମାର ମତୋ ଓପରଭାବୀ-ବୃପରଭାବୀ ରମଣୀକେ ପେଯେ ଥିଲ୍ୟ । ତୁମି ଏକଇ ସମେ ଆମାର ମନେର ରାନ୍ତିମ ଏବଂ ଆମାର ଦେଶେରଙ୍କ ରାନ୍ତିମ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିଯ ମୁଖୀ ହବେ । ସଦିଓ ତୋମାର ପିତା ତୋମାର ପ୍ରତି ଏହି ରକମ ନିଷ୍ଠିର ଓ ଅମାନବିକ ବ୍ୟବହାର କରିଛେନ, ତବୁଓ ତୁମି ତା'ର କାହେ ବିଦାୟ ନିଯେ ଏସୋ ।’

କର୍ତ୍ତେଲିଆ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନେ ପ୍ରଥମେ ପିତା ଓ ପରେ ଭଗ୍ନିଦୟର କାହେ ବିଦାୟ ନିଯେ ଫାଲେର ଯୁବରାଜେର ମେଂଜେ ଚଲେ ଗେଲ ।

ଗନେରିଲେର କାହେ କରେକ ସଞ୍ଚାହ ଥାକାର ପରାଇ ରାଜୀ ଲିଯାର ଟେର ପେତେ ଲାଗିଲେନ ମେଯେର କଥା ଓ କାଜେର ମଧ୍ୟେ କୀ ଆକାଶ-ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ । ଗନେରିଲ ପିତାର ମେଂଜେ ଭାଲୋ କରେ କଥା ବଲେ ନା, ପିତାର ଅନୁଚର ଯୋଦ୍ଧାରଙ୍କୀଦେର କାର୍ଯ୍ୟକଲାପେ ଖୁବ୍ ଧରେ, ଗନେରିଲେର କାଜେର ଲୋକେରା ରାଜାକେ ଥଥାଯୋଗ୍ୟ ସମାନ କରେ ନା । ଏତେ ଅତିପଦେଇ ଲିଯାରେ ମେଜାଜ ଖାରାପ ହତେ ଲାଗଲ । ରାଜୀ ଦିଶେହରା ହେବେ ଗେଲେନ । ଏ କୀ କାଣ! ଯେ ମେଯେ ମାତ୍ର କରେକ ସଞ୍ଚାହ ଆଗେ ତାକେ ବଲେଛେ, ତାର ଜୀବନେର ଚେଯେଓ ବେଶ ତାକେ ଭାଲୋବାସେ, ଯାକେ ତିନି ତା'ର ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧକ ଦାନ କରିଛେନ, ରାଜମୁକୁଟ ପର୍ବତ ଜାମାତର ମାଥାଯ ବସିଯେଛେନ, ମେହି ଆଦରେର ମେଯେର ଏଥିନ ଏ କୀ ବ୍ୟବହାର, ଏ କୀ କାଟୁ କଥା! ରାଜାକେ ଯେନ ସେ ସହ୍ୟ କରିତେ ପାରିଛେ ନା । ରାଜାର ଏକଶ ଜନ ଯୋଦ୍ଧା-ସହଚରକେ ସେ ଉତ୍ପାତ ବଲେ ମନେ କରଇଛେ । ସେ କି-ନା ପିତାର ମୁଖେର ଓପରାଇ ବଲେ ଦିଲ, ତା'ର ଏତଙ୍ଗଲୋ ରଙ୍ଗି-ଅନୁଚରେର କୋନୋ ପ୍ରଯୋଜନଇ ନେଇ ।

বিষম ক্রেতে লিয়ার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে অনেক তিরঙ্গার করলেন। তারপর অশ্ব প্রস্তুত করতে বললেন। তিনি আর একমুহূর্ত এই অকৃতজ্ঞ কন্যার প্রাসাদে থাকবেন না। তাঁর আরো একটি মেয়ে আছে। তিনি রিগানের কাছে চলে যাবেন। সেই মর্মে একটি চিঠি লিখে তিনি কাইয়াসকে দিয়ে রিগানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু গনেরিলও কম যায় না। সেও তড়িঘড়ি রিগানকে একটি চিঠি পাঠাল। তাতে লিখল, রাজা লিয়ার বৃক্ষ বয়সে কী রকম অবিবেচক, বদমেজাজি এবং উপন্দ্রবন্ধুরূপ হয়ে উঠেছেন। তাঁর একশ জন যোদ্ধা-সহচরও গনেরিল এবং রিগানের পক্ষে হৃষিক্ষণুপ। রিগান যেন লিয়ারকে কোনোভাবেই পাত্তা না দেয় এবং তাঁর রক্ষীসংখ্যা কমাবার জন্য যেন চাপাচাপি করে।

গনেরিল এই চিঠি পাঠিয়েই ক্ষান্ত রইল না, সে লিঙ্গও রিগানের কাছে চলে গেল। রাজা লিয়ার রিগানের প্রাসাদে এসে দেখেন, বোনের হাত ধরে গনেরিল সেখানে উপস্থিত। রিগান ছির কষ্টে পিতাকে জানাল, সে এখন লিয়ার এবং তাঁর একশ রক্ষীকে সমাদর করার জন্য প্রস্তুত নয়। লিয়ারের উচিত রক্ষীসংখ্যা কমিয়ে অর্ধেক করে বড়ো মেয়ের কাছে ফিরে যাওয়া এবং নির্ধারিত সময়টুকু সেখানেই কাটানো। রাজা লিয়ারের পরিচিত জগৎ তাঁর চোখের সামনেই উল্টে গেল। এ কী কথা তিনি শুনছেন তাঁর দ্বিতীয় কন্যার মুখে! এই মেয়ে দুটিই কি তাঁকে মাত্র করেক সন্তান আগে পৃথিবীর সর্বোত্তম ভালোবাসার কথা শনিয়েছিল? সেই একই মেয়ে দুটিই কি এই রকম নিষ্ঠুর বাক্য কঠিন মুখ করে শোনাচ্ছে? ক্রোধে, দুঃখে, অগমানে রাজা লিয়ার উপলক্ষ্মী করলেন, তাঁর জীবদ্ধশাতেই এভাবে রাজ্য বিলিয়ে দিয়ে, ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি কী ভুল করেছেন! সেই সঙ্গে উপলক্ষ্মী করলেন, কর্ডেলিয়ার প্রতি তিনি কী নিদানুকূল অবিচার করেছেন।

রাজার এই রকম দুঃসময়ে তাঁর পাশে যে দুজন বিশুল্প অনুচর রয়েছে, তারা হলো রাজার প্রিয় বিদূষক, যে তাঁকে সব সময় মজার মজার কথা বলে হাসায়, আলন্দ দেয়। লিয়ার তাঁর রাজমুকুট জামাতাকে দিয়ে দিলেও বিদূষকটি রাজার পাশ ছাড়েনি। সে রাজাকে ঘৰ্যার্থই ভালোবাসে। আর রয়েছে কাইয়াস নামে এক লবনিয়ুক্ত ভূত্য। কাইয়াস আসলে ছাইবেশী আর্ল অব কেন্ট। রাজা লিয়ার যদিও তাকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন, রাজার প্রতি আনুগত্যবশত কেন্ট রাজাকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারেনি। রাজা বৃক্ষ, রাজা খামখেয়ালি, রাজা মেজাজি, তবু তো তিনি রাজাই। কন্যাদের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসার বশে তিনি জীবদ্ধশাতে রাজ্য ও রাজমুকুটের দখল হেঢ়েছেন, অথচ সেই অকৃতজ্ঞ কন্যারা আজ তাঁকে কী হেনস্তাই না করছে। মেজো মেয়ের কাছ থেকেও এরকম ঘ্যবহার পেয়ে রাজা প্রায় পাগলের মতো হয়ে গোলেন। সে সময় বাইরে তুম্বুল ঝড়বৃষ্টি চলছে। রিগান কিছুতেই পিতাকে তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেবে না। তাঁকে বড়ো মেয়ের কাছেই ফিরে যেতে হবে। রাজা বৃক্ষ হলো আত্মর্যাদাবোধ এখনও হারাননি। তিনি সেই তুম্বুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই প্রাত্মরে বেরিয়ে গোলেন।

ঝড়বৃষ্টির রাতে রাজা লিয়ার এক চালাঘরে এসে আশ্রয় নিলেন। সেখানে বসবাসকারী এডগারকে দেখে রাজার বিদূষক প্রথমে ভয় পেয়ে যান। এডগার পাগলের অভিনয় করার জন্য কাপড়চোপড় সব খুলে উল্লস হয়ে কোমরে শুধু একটা কম্বল জড়িয়ে থাকার জন্য বিদূষকটি প্রথমে ভেবেছিল, ওটা একটা ভূত বা প্রেত। পরে

ଏଡାଗାରେ କଥା ଶୁଣେ ଆଶ୍ଚର୍ମିତ ହଲୋ— ଓଟା ନେହାତିଇ ଏକଟା ପାଗଳ । ରାଜା ଲିଯାର ତାକେ ଜିଞ୍ଜାସା କରଲେନ, ‘ତୁ ମିଓ କି ତୋମାର ମେଘୋଦେର ସବ ଦାନ କରେ ଦିଯେ ଏହି ରକମ ନିଃଷ୍ଟ ହେଁଛୁ?’ ମେଘୋଦେର ନିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାରେ ଲିଯାରେର ମନ ଏମନ୍ତି ଭୋଲେ ଗିଯେଛେ ଯେ ତିନି ଉନ୍ନାଦ ହୁଅଯାର ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଚଲେ ଗେଛେନ ।

କେନ୍ଟ ତାକେ ଦେଖିଛେ ଆର ଭୀତ ହଜେ । କୀ କରେ ରାଜାକେ ଏହି ଦୂର୍ଦ୍ଵା ଥିକେ ଉଦ୍ଧାର କରବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ସେ ଆହିର । ଲେ ଇତୋମଧ୍ୟେଇ ଯେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତା-ଓ ବେଶ ବିପଞ୍ଜନକ । ଗନେରିଲ୍ ଓ ରିଗାନେର ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଫଳେ ଲିଯାରେର ଜୀବନଓ ଏବନ ଆର ନିରାପଦ ନାହିଁ । ଯତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ରାଜାକେ ଏଖାନ ଥିକେ ସରିରେ ନିରେ ଯାଓଯା ଥିଲେଜନ । କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେବେକମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନାଦ ହେଁବେ ଗିଯେଛେନ, ତାତେ ତାକେ ବୁଝିଯେ-ସୁବିଧେ ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ ନିଯେ ଯାଓଯା ଖୁବ କଟ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର । ଗ୍ରୁସ୍ଟାର କେଟେର ସାହାଯ୍ୟେ ଏଗିଯେ ଏଲେନ । ତିନି ରିଗାନ ଓ ତାର ସ୍ଵାମୀ କର୍ନ୍‌ଯୋଲେର ନିଷ୍ଵେଦ ଅନ୍ଧାହ୍ୟ କରେ ରାଜାକେ ତାର ପ୍ରାସାଦେ ନିଯେ ଗେଲେନ । ଏ କାଜେ ତାକେ ବେଶ ବେଶ ପେତେ ହଲୋ । କଜନ ଅନୁଚର ମିଳେ ରାଜାକେ ବେଶ କରେ ଠେଣେ ଧରେ ତବେ ପ୍ରାସାଦେ ଆନତେ ପାରିଲ । ପ୍ରାସାଦେର ଭିତରେ ଏସେ ଲିଯାର ଏକ କାଙ୍ଗାନିକ ରାଜଦରବାର ବସିଯେ ତାର ବଢ଼ୋ ଦୁଇ ମେଘର ବିଚାର କରିବେ ଶୁଣୁଟି କରିଲେନ । ତାର ଏହି ବନ୍ଦ-ଉନ୍ନାଦ ଅବହ୍ଳା ଦେଖେ ବିଶ୍ଵଷ୍ଟ ଆର୍ଲ ଅବ ଗ୍ରୁସ୍ଟାରେର ଚୋଖ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁବେ ଉଠିଲ । ତିନି ଆର୍ଲ ଅବ କେନ୍ଟକେ ବଲିଲେନ, ରାଜାକେ ଡୋଭାରେ ନିଯେ ଯେତେ । ମେଖାନେ ଅନ୍ତତ ରାଜାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଭୟ ଥାକିବେ ନା । ତାରପର ମେଖାନ ଥିକେ ଫ୍ରାଙ୍କେର ରାନି କର୍ଡେଲିଯାକେ ସଂବାଦ ପ୍ରେରଣ କରା ଯୋଟେଇ କଠିନ ହବେ ନା । କାରଣ ଡୋଭାର ଫ୍ରାଙ୍କେର କାହାକାହି ବିଟିନେର ସୀମାନ୍ତେ ଅବହିତ । ଡୋଭାରେର ପରେଇ ହୋଟୋ ଏକଟି ଚ୍ୟାନ୍ଦେଲ ପାର ହେଁବେ ସୀମାନ୍ତ ଶୁଣୁ ହୁଏ ।

ଓଦିକେ ଗନେରିଲ୍ ସଥିନ ସଂବାଦ ପେଲ ଯେ ରାଜା ଲିଯାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଶହର ଡୋଭାରେ ପୌଛେଛେନ, ତଥିନ ମେ ନିଜେଦେର ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆତମିତ ହେଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଲ ଲିଯାରେ ବିକରିକେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା କରିବେ ହବେ । ଏହି ମର୍ମେ ମେ ସଥିନ ବୋନ ରିଗାନେର କାହେ ଥିବର ପାଠାତେ ଯାବେ, ତଥିନ ଶୁଣି ଭାଙ୍ଗିପତି କର୍ନ୍‌ଯୋଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ । ତଥିନ ମେ ଏଡମଣ୍ଡେର ସାହାଯ୍ୟେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଁବେ । ଗନେରିଲେର ସ୍ଵାମୀ ଡିଉକ ଅବ ଆଲବେନି ସବସମଗ୍ରୀ ରାଜା ଲିଯାରେର ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରତ ଛିଲେନ ଏବଂ ତ୍ରୀର ଏହି ନିଷ୍ଟର ଆଚରଣ କଥିନୋ ସମର୍ଥନ କରିଲେନ ନା । ତିନି ମନେ ମନେ ଛିର କରିଲେନ ରାଜା ଲିଯାରକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନ ।

ଫ୍ରାଙ୍କେର ରାନି କର୍ଡେଲିଯା ବେଶ ସୁଖ ଏବଂ ସମ୍ମାନେର ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ-ସାମାଜିକ କରାଇଲି । କେବଳ ପିତାର କଥା ମନେ ହଲେ ତାର ବୁକେର ଭିତର ଏକଟି ବ୍ୟଥାର କାଁଟା ଥିଲେଟା କରିବାକାରୀ । ହଟ୍ଟାଟ ଏକଦିନ ମେ ଥିବରପେଲ, ତାର ପିତା ଖୁବ କାହେ ଫ୍ରାଙ୍କ-ସୀମାନ୍ତର ପାରରେ ହେଁବେ ଗିଯେଛେନ— ଏସବ ଥିବରତ କର୍ଡେଲିଯାର କାନେ ଏଲ । ଓନେ ତାର ଦୁଇ ଚୋଖ ଦିଯେ ଟପଟପ କରେ ଅଶ୍ରୁ ବରତେ ଲାଗଲ । ତାର ସ୍ଵାମୀ ଫ୍ରାଙ୍କେର ରାଜାକେ ଅନୁରୋଧ କରିଲ, ରାଜା ଯେବେ ତାର ସଙ୍ଗେ କିଛୁ ସୈନ୍ୟ ଦେନ ଯାତେ ମେ ଡୋଭାରେ ଗିଯେ ପିତାର ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହତେ ପାରେ ଏବଂ ଦୁଇ ଡୋଭାରେ ସମ୍ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକେ ପରାଜିତ କରେ ତାର ପିତାକେ ଆବାର ତାର ସିଂହାସନେ ବସାତେ ପାରେ । ଫ୍ରାଙ୍କେର ରାଜା କର୍ଡେଲିଯାର ସଙ୍ଗେ ଡୋଭାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସେ ଆବାର ଜଙ୍ଗରି କାଜେ ଫ୍ରାଙ୍କେ ହିଲେନ । କର୍ଡେଲିଯା ଡୋଭାରେର ପଥେ-ପ୍ରାନ୍ତରେ ପିତାକେ ଝୁଜେ ବେଢାତେ ଲାଗଲ । ଲିଯାର ଏମନ୍ତି ଥାମଥେଯାଲି ଯେ ଏକ ଜାଗଗାୟ ତାକେ ଛିରଭାବେ ରାଖା ଯାଯା ନା । ତିନି ଥାଯାଇ ଅନୁଚରଦେର ଦୃଷ୍ଟିକେ ଫାଁକି ଦିଯେ ଏଦିକ-ଓଦିକ ଛୁଟେ ବେଢାନ ।

লিয়ার এখনো ঘোর উন্মাদ। কডেলিয়ার লোকজনও রাজাকে সর্বত্র খুঁজছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন মাঠে এসে রাজার দেখা গেল এবং বেশ কায়দা করে রাজাকে নিয়ে গেল কডেলিয়ার শিবিরে। কডেলিয়া চোখের পানি চেপে মমতা ও যত্নের সঙ্গে অসুস্থ পিতার সেবা করতে লাগল। চিকিৎসকের যথাযথ ঔষধ প্রয়োগে এবং কডেলিয়ার সেবাযতে লিয়ার ধীরে ধীরে সৃষ্ট হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু রাজা লিয়ারের ভাগ্য নিতান্তই খারাপ। তাঁর দৃঢ়খ ও অপমানের দিন এখনো যেন শেষ হয়নি।

গনেরিল ও রিগানের প্রেরিত সম্মিলিত সেনাবাহিনীর কাছে কডেলিয়ার অপ্রতুল সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং রাজা লিয়ার কডেলিয়াসহ বন্দি হলেন। এডমন্ট কৌশলে গুণ্ডাতককে নির্দেশ দিয়ে কডেলিয়ার প্রাণসংহার করাল। রাজা লিয়ারের শেষ অবস্থানটুকুও এভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল। তাঁর বুকফাটা হাহাকারে এই অকর্তৃ পৃথিবীর নির্মম আকাশগু যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

(সংক্ষেপিত)

লেখক-পরিচিতি

ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবশালী কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র। তাঁর জন্ম ইংল্যান্ডের স্ট্রাটফোর্ড-অব-আর্ডনে, ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। শেক্সপিয়রের জীবন ছিল দুঃখ-দুর্দশায় ভরা। মাত্র বায়ান বছরের জীবনের মধ্যে তাঁর সাহিত্য রচনার কাল ছিল তিরিশ বছরেরও কম। তিনি কমেডি ও ট্র্যাজেডিধর্মী নাটক রচনা করলেও পৃথিবীর সেরা ট্র্যাজেডি-লেখক হিসেবেই সম্মান পান। শেক্সপিয়রের সেরা ট্র্যাজেডিগুলো হচ্ছে ‘হ্যামলেট’, ‘ম্যাকবেথ’, ‘ওথেলো’ ও ‘কিং লিয়ার’। উল্লেখযোগ্য কমেডিগুলো হচ্ছে ‘কমেডি অব এরেকস’, ‘অ্যাজ ইউ লাইক ইট’, ‘আ মিডসামার নাইটস ড্রিমস’ ইত্যাদি। এসব নাটকে তিনি আনন্দ-বেদনার অক্তরালে মানুষের জীবনের গভীর সত্যকে সন্ধান করেছেন। শেক্সপিয়র মৃত্যুবরণ করেন ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে।

রূপান্তরকারী লেখক-পরিচিতি

জাহানারা ইমামের জন্ম ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায়। পেশায় তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক, ছিলেন নিবেদিত সংস্কৃতিকর্মী ও সংগঠক। জাহানারা ইমাম একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। সাহিত্যজীবনে শিশুসাহিত্য, অনুবাদ, মুক্তিযুদ্ধ, মৃত্যুকথা প্রভৃতি বিচিরণ ধরনের রচনার সৃষ্টিমূখ্যের ছিলেন। ‘একাত্তরের দিনগুলি’ তাঁর সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাঁর উল্লেখযোগ্য অপর গ্রন্থগুলো হচ্ছে ‘ক্যাপারের সঙ্গে বসবাস’, ‘শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি’, ‘নিঃসঙ্গ পাইন’। ‘গজকচ্ছপ’, ‘সাতটি তারার ঝিকিমিকি’ ইত্যাদি তাঁর শিশুতোষ রচনা। একাত্তরে জাহানারা ইমামের জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা সফি ইমাম কর্মী শহিদ হওয়ার কারণে তিনি ‘শহিদ-জননী’ হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও দ্বাদশীনতা পদকও লাভ করেন। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

রচনাটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ‘কিং লিয়ার’ নাটকের সংক্ষিপ্ত আখ্যান বা গল্পরূপ। ব্রিটেনের রাজা লিয়ার বৃদ্ধকালে ছির করলেন তাঁর তিন মেয়ে গনেরিল, রিগান আর কর্ডেলিয়াকে রাজ্য ভাগ করে দেবেন। রাজসভা ডেকে সভাসদদের সামনেই তিন মেয়েকে একে একে জিজেস করলেন কে তাঁকে কতটুকু ভালোবাসে। বড়ো দুই মেয়ে গনেরিল আর রিগান বলে দিল তারা তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি বাবাকে ভালোবাসে সুতরাং তিনি তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সমানভাগে ভাগ করে দিলেন। ছোটো মেয়ে কর্ডেলিয়াকে রাজা ভালোবাসতেন বেশি, তাই তার কাছে প্রত্যাশাও ছিল বেশি। কিন্তু এই কল্যার কাছে যা শুনলেন তাতে, রাজা গেলেন খেপে। কর্ডেলিয়া বলল, একটি মেয়ের তার বাবাকে যতটা ভালোবাসা কর্তব্য ততটাই সে ভালোবাসে। রাজা লিয়ার কর্ডেলিয়াকে ত্যাজ্য করলেন, তাকে রাজ্য থেকে বের করে দিলেন এবং সম্পূর্ণ রাজ্য বড়ো ও মেজো মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রাজা লিয়ারের এমন অবিচক্ষণ সিদ্ধান্ত তার জীবনের জন্য কাল হলো। সমুদয় রাজ্য দুই মেয়েকে দান করায় তিনি তাদের করুণার পাত্র হয়ে পড়লেন; একসময় দুর্বোল মিলে রাজাকে রাজবাড়ি থেকে বের করে দিল। রাজার জীবনে নেয়ে এল দুষ্পর্য গ্লানি আর দুঃখ। তিনি বুঝতে পারলেন, গনেরিল আর রিগানের ভালোবাসা ছিল মেঝি আর কর্ডেলিয়ার ভালোবাসা ছিল সত্যিকারের। কিন্তু তাঁর করার কিছুই ছিল না। একপর্যায়ে তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে যান। লিয়ারের এই দুষ্পর্যয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ায় ত্যাজ্য ছোটো মেয়ে কর্ডেলিয়াই। মানুষ তার নিজের ভূলের জন্য দুঃখ, কষ্ট আর বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। কিং লিয়ার তোষামোদে তুষ্ট হয়ে জীবনে করুণ পরিণতি ডেকে এনেছেন। ভুলে গিয়েছিলেন প্রকৃত ভালোবাসা অনুভূতির ব্যাপার, তা পরিমাপযোগ্য বিষয় নয়।

শব্দার্থ ও টাকা

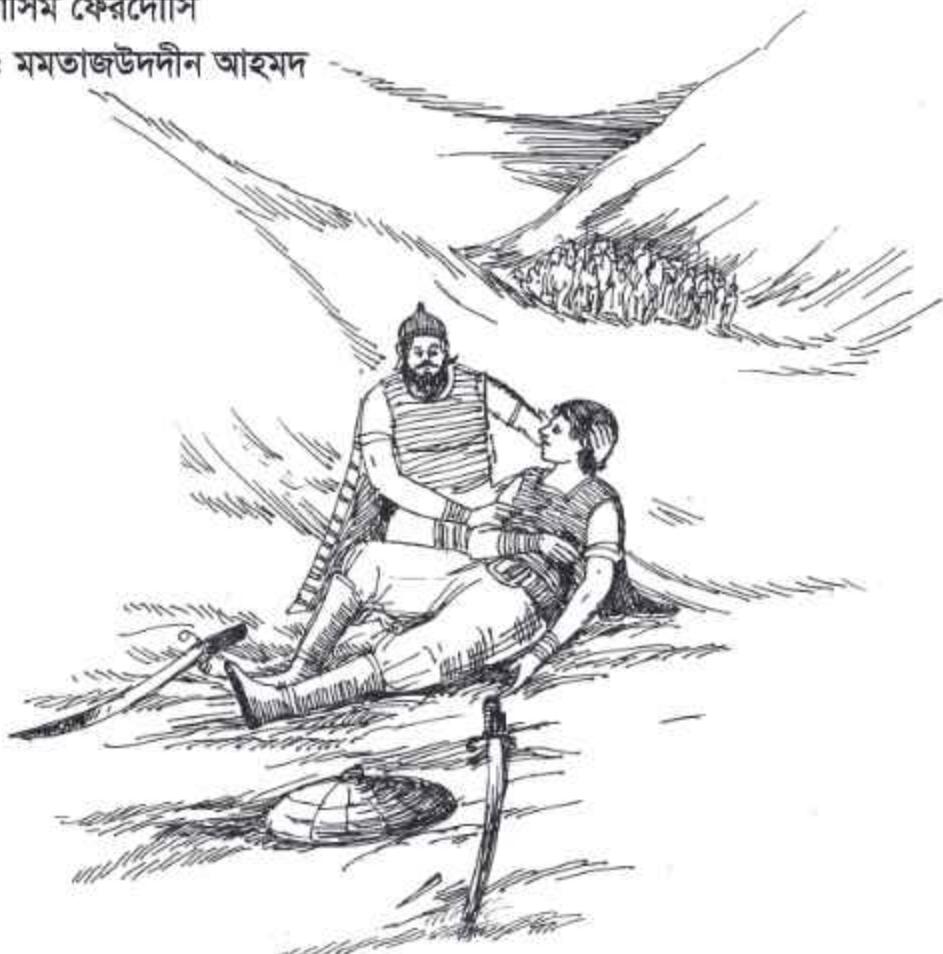
ডিউক	— ইংল্যান্ডে প্রচলিত একটি সম্মানজনক উপাধি। ইংরেজি Duke.
পানিপাথী	— বিয়ে করতে ইচ্ছুক।
আর্ল	— একটি উপাধি। ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল।
জ্যোতি	— আলো, উজ্জ্বল।
সন্তোষ	— আনন্দ, খুশি।
এক-তৃতীয়াংশ	— তিন ভাগের এক ভাগ।
হষ্টচিষ্ঠে	— আনন্দচিষ্ঠে, খোশমেজাজে।
সৃষ্টিত	— কোনো কারণে জড়ের মতো হয়ে যাওয়া। নির্বাক।
ক্রোধ	— রাগ।
পালাক্ষমে	— একে একে।
আনন্দোৎসব	— আনন্দ উদ্যাপনের জন্য যে উৎসব।
অঙ্গসারশূন্য	— যার ভেতরে কিছু নেই।
তোষামোদ	— চাটুকারিতা।
ক্ষিপ্ত	— ক্ষুক, রাগাস্থিত।

କପର୍ଦକଶୂନ୍ୟ	— ଟାକା-ପରସା ନେଇ, ଏମନ ବୋକାନୋ ହେଁଯେହେ ।
ଅଞ୍ଚଳପୂର୍ଣ୍ଣ	— ଜଳେ ଭରା ।
ଓତ୍ତେଦ	— ପାର୍ଥକ୍ୟ ।
ଅନୁଚର	— ସଙ୍ଗୀ, ସହଚର, ଭ୍ରତ୍ୟ ।
ଯୋଦ୍ଧାରକୀ	— ପାହାରାଦାର ସେନା ।
ଉତ୍ତପାତ	— ସତ୍ରଳା, ଉପଦ୍ରବ ।
ତଡ଼ିଘଡ଼ି	— ତାଡ଼ାତଡ଼ି ।
ରକ୍ଷୀ	— ପାହାରାଦାର, ସେନା ।
ଉପଲକ୍ଷୀ	— ଅନୁଭ୍ରବ, ଅନୁଭୃତି, ବୋଧ ।
ନିଦାରଣ	— କଠିନ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ।
ବିଦୂଷକ	— ଭାଙ୍ଗ, ଯେ କୌତୁକ କରେ । ରମେଶ-ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅନୁଚର ।
ଖାମଖେଯାଳି	— ସେୟାଳଖୁଶି, ଖୁଶିମତୋ ଚଳାର ସ୍ଵଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ।

যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্র

আবুল কাসিম ফেরদৌসি

বৃপ্তান্ত : মমতাজউদ্দীন আহমদ



যুদ্ধের সাজ পরে নিল সোহরাব। তার বর্ণ আকাশের দিকে ঝালিত হলো। সে যাবে শক্তি নিখনে, যে তার মাতৃল
বিন্দারজমকে গোপনে হত্যা করে গেছে। কিন্তু সবার আগে সে সঞ্চান করবে জন্মাতা মহাবীর রক্তমের।
পিতাকে পেলে সম্ভত ত্রৈধ নির্বাপিত করে তাঁর বক্ষে ঘাথা রেখে দীর্ঘক্ষণ শান্তি লাভ করবে সোহরাব।

দুর্গের বন্দি সেনাপতি হজিরকে নিয়ে সোহরাব পাহাড়ের শীর্ষে উঠল। ব্যাকুল সোহরাব বলল, ‘ওই যে সবুজ
রঙের শিবির, সেখানে এক বিশাল বীর গর্জন করছেন। আর তাঁর শিবিরের সম্মুখে প্রবল দুরত অশ্ব অধীরতা
প্রকাশ করছে, তাঁর পতাকায় আজ্ঞাদাহার চিত্র আঁকা আছে, তাঁর বর্ণার ডগায় সিংহের মুখ, কে তিনি? বন্দি
সেনাপতি, সত্য করে বলুন তো, তিনি কি মহাবীর রক্তম?’

সোহরাবের ব্যাকুল প্রত্যশাকে ক্ষান্ত করে কৌশলী হজির বললেন, ‘আপনার ধারণা সত্য নয়। ওই মহাবীরের
প্রকৃত পরিচয় আমি জানি না। তিনি চীনদেশীয় একজন বীর বলে মনে হয়। তবে তিনি যে মহাবীর রক্তম নন,
সে বিষয়ে আমার কোনো ভ্রম নেই।’

সোহরাব বলল, ‘তবে যে আমাকে আমার জন্মনী বলে দিয়েছেন, ঠিক ওই রূক্ম দেখতে, ঠিক ওই রূক্ম দেখ
মহাবীর রক্তমের।’

সোহরাব : ওহে বন্দি, আমি তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমাকে বিশ্বাস করব না আমি। আর বিশ্বাস করলে এ সমরে আমার অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ অস্থিতি, উদ্দেশ্যহীন হবে।

হজির : আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি মহসুম বীর।

সোহরাব : আপনারা কেউ আমার চিত্তের সমন্বয়ের গর্জন শুনতে পাবেন না।

সোহরাব বেদনায় অস্থির হয়ে ছুটে গেল। তুর্কি সেনাপতি হমান ও বারমানকে বারবার জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনারা ও কি বন্দি হজিরের মতো অনুমান করেন, এ সমরে মহাবীর রূপ্তম অংশগ্রহণ করেননি?’ আফ্রিসিয়াবের চতুর সেনাপতিদ্বয় বলল, ‘আমরাও শুনছি মহাবীর রূপ্তম ক্ষুক হয়ে জাবুলজ্ঞান ফিরে গেছেন। তিনি এ যুদ্ধে সন্তান কায়কাউসকে রক্ষা করার জন্য উপস্থিত থাকবেন না।’

ব্যাকুল সোহরাবের সমস্ত প্রত্যাশা মিথ্যার পাথরে আছাড় খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে লাগল। বন্দি হজির ভয়ংকর মিথ্যা বললেন কেন? তিনিও কি হমান ও বারমানের সঙ্গে কৃটকৌশলে যুক্ত হয়ে পিতাপুত্রকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চান? নাকি এ তার দেশপ্রেম? যে প্রেমের জন্য তিনি সোহরাবকে সুযোগ দেবেন না রূপ্তমকে অভর্কিত আক্রমণ করতে। নাকি সব নিয়তির লীলা! বাঞ্ছিকই মানুষ বড়ো অসহায় নিয়তির লীলার কাছে। তৎপাত্র যুবক ছুটে এসেছে না-দেখা পিতার সন্ধানে। যে পিতাকে জগতের সবাই চেনে, যাঁর গৌরবে ইরান বিমুক্ত, সেই পিতাকে তার পুত্র এত কাছে এসেও চিনতে পারছে না। কেন এমন হলো, এমন কেন হয় মানবভাগ্য?

ক্ষুক সোহরাব অতি দ্রুত সজিত করল নিজেকে। বর্ণা, গদা, পাশ ও সুরক্ষিত বর্মে আচ্ছাদিত করল দেহ। দুর্বল অশুকে নিয়ে বায়ুবেগে ছুটে গেল ইরানিদের প্রাণেরে। শত্রুসেন্যদের সমাবেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সোহরাব সরাসরি চলে এল সন্তান কায়কাউসের শিবিরের কাছে। আহ্বান করল সন্তানকে, মহান অধিপতি, আমার আহ্বান শ্রবণ করছেন। আমি যুদ্ধে আহ্বান করছি আপনার বীর উত্তমদের। আর কোথায় আপনার মহসুম বীর রূপ্তম? শুনেছি তিনি জাবুলজ্ঞান চলে গেছেন, তাঁকেও আহ্বান করে আনুন। আমি যুদ্ধ চাই।

সোহরাবের আহ্বানে সন্তান কায়কাউস ভীত এবং সচকিত হলৈন। যুবকের আহ্বানে সেনাপতিবৃন্দ সন্তুষ্ট হলৈন। তার সম্মুখে ঘাওয়ার সাহস কারও নেই।

এ সংকটকালে একমাত্র রক্ষাকারী মহাবীর রূপ্তম। তাঁকে শীত্র সংবাদ দেওয়ার হ্যেক। তিনি যদি অভিমান করে এ বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সম্মত না হন, তখন কী হবে?

সেনাপতি গেও গেলেন রূপ্তমের শিবিরে সন্তানের অনুরোধ নিয়ে। গেও বললেন, তুরানের এক যুবক বারবার আপনার নাম আহ্বান করছে। সে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়।

রূপ্তম : আমি কেন সেই সামান্য বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করব?

গেও : ইরানের গৌরবের জন্য, ইরান রক্ষার জন্য।

রূপ্তম : সংকটকালেই আমার ভাক পড়ে। আমি এবার কেবল যুদ্ধ দেখব, যুদ্ধে লিঙ্গ হব না।

গেও : সন্তানের পরামর্শ, আপনি আত্মপরিচয় গোপন রেখে তুরানি বীরের মোকাবিলা করবেন। সে জানবে আপনি রূপ্তম নন, রূপ্তমের অনুচরমাত্র।

- রঞ্জন : আমার শিরকাণ, প্রহরণ, আমার বর্ণা আর বর্ম দেখলে সে বুঝে নেবে আমিই রঞ্জন !
- গো : তাহলে কি অবাধ্য যুবকের দণ্ড মেনে নিয়ে আপনি এ যুদ্ধে নীরব থাকবেন ?
- রঞ্জন : চুপ করো। রঞ্জনকে যুদ্ধের বিষয়ে উগদেশ দিয়ো না। যাও, তোমার নির্বোধ সন্দ্রাটকে বলো, আমি যুদ্ধে যাব এবং তুরানি বালকের দণ্ড মৃত্যুকার মৃষ্টিত করে তার আশঙ্কা দূর করব ।
- গো : আপনি সত্ত্বাই মহান বীর। আপনি প্রকৃত ইরান-ভরসা ।
- মনের আনন্দে গোও চলে গেলেন। রঞ্জন মনে মনে কৌশল করে নিলেন। তুরানি বালকের কাছে তিনি নিজ পরিচয়ে উদ্ঘাটিত হবেন না ।

সামান্য অনুচর হিসেবে সজ্জিত হলেন রঞ্জন। হাস্যমুখে শিবির থেকে নিষ্পত্ত হলেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে অবিচল পর্বতের মাতো অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন সোহরাব। আজ দিনের আলোতে সোহরাবকে দেখে প্রথম দৃষ্টিতে রঞ্জন অভিভূত হয়ে গেলেন। এ তো কোনো তুরানি বীর নয়, এ তো ইরানের সন্তান। এ বালকের মুখ তো মহাবীর সামের মুখ। এ বালক কে? কে এই যুবককে আমার বিকলে যুদ্ধে প্রেরণ করেছে? সে যদি তার জন্মদায়িনী মাতা হয়, তাহলে ভুল করেছে। আমি তো এ বালককে এখনই চির অক্কার মৃত্যুর গহ্বরে নিষ্কেপ করব ।

আর অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন সোহরাব বিমুক্ত দৃষ্টিতে অবিচল তাকিয়ে আছে রঞ্জনের দিকে। কে ইনি? ইনিই কি সেই মহাবীর, যার বিষয়ে আমার মা আমাকে বছ কথা বলেছেন ।

সোহরাব : আপনি !

রঞ্জন : তুমি?

সোহরাব : আমি সোহরাব ।

রঞ্জন : আমি রঞ্জন নই ।

সোহরাব : কে আপনি?

রঞ্জন : আমার পরিচয় জানার জন্য তোমাকে পর্বতের ওই নির্জন পাদদেশে যেতে হবে। নিভৃতে আমার পরিচয় দেব তোমাকে ।

সোহরাব : আপনি কখনও সামনগা গিয়েছেন?

রঞ্জন : সামনগা যাওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার কোনোদিন হয়নি ।

সোহরাব : তাহলে আমি যা শুনেছি সব অলীক?

রঞ্জন : বালক, তোমার সঙ্গে কেবল যুদ্ধের কথা বলব, সামান্য তুচ্ছ বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করলে আমার গ্রন্ত রুট হবেন ।

সোহরাব : কে আপনার প্রভু?

রঞ্জন : আমার প্রভু মহাবীর রঞ্জন ।

সোহরাব : কোথায় তিনি?

রঞ্জন : আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে যদি জীবিত থাকো, তাহলে তোমাকে কেউ না-কেউ বলে দেবে মহাবীর রঞ্জন কোথায়? কিন্তু তুমি আদৌ সে সৌভাগ্য নিয়ে ইরানে পদার্পণ করেছ, তা মনে করিনা ।

রুক্ষম ও সোহরাব কোনোভাবেই একে অপরকে চিনতে পারল না। যুদ্ধপ্রাণ্তরে উভয়ের মধ্যে প্রতিহিংসার আঙুল জুলছে, সেখানে দেহ ও প্রেমের শান নেই। পঞ্চ তার সম্ভানকে হয়তো চিনতে পারে, শ্রেতের মাছ হয়তো তার শাবকদের দেহদান করে, কিন্তু প্রতিহিংসার অনলে দম্ভীভূত মানবগতি তার পুত্রকে অথবা মানবপুত্র তার পিতাকে চিনতে পারে না।

পাহাড়ের পাদদেশে সংকীর্ণ প্রাণ্তরে দুই বীরের যুদ্ধ চলছে। বর্ণার যুদ্ধ, গদার যুদ্ধ। দুজনের দুর্দমনীয় যোগ্যতা। দুজনের অশ্ব ক্লান্ত হলো। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে আসন পড়ে গেল। রুক্ষম ভাবছেন, এ কোন আজেয় বীর যে আমার এত কালীর অহংকার চূর্ণ করার জন্য এসেছে? আর সোহরাব ভাবছে, এই যদি রুক্ষমের অনুচর হয়, তাহলে আমার পিতার শৌর্য কত প্রবল!

রুক্ষম সোহরাবের কটিদেশের বক্স ধরে টান দিলেন। কিন্তু সোহরাবকে এক চুলও নড়াতে পারলেন না। সোহরাব গদা দিয়ে আঘাত করল রুক্ষমকে। ব্যথা পেলেন রুক্ষম, তাঁর হাতে রক্ত।

সোহরাব বলল, ‘আপনাকে আর আঘাত করব না। আপনাকে আঘাত করলে সংকোচ আর ব্যথা হয় আমার। শিবিরে ফিরে যান আপনি।’

রুক্ষম ক্রোধাক্ষ হলো। ছুটে গেলেন তুরানিদের মধ্যে। অকাতরে হত্যা করলেন সৈন্যদের। সোহরাবও ছুটে গেল ইরানিদের মধ্যে, সে-ও হত্যা করল বহু ইরানি সৈন্য।

রুক্ষম ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সোহরাবকে বললেন, ‘এ তুমি কী করছ?’

সোহরাব বলল, ‘আপনি যা করলেন তার শোধ নিলাম আমি।’

ক্ষুব্ধ ও বিমর্শ রুক্ষম চলে গেলেন শিবিরে। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, ‘আজ অঙ্ককার নেমে আসছে কাল প্রভাতে এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে এসো।’

সোহরাব মৃদু হেসে বলল, ‘আপনি প্রস্তুত থাকবেন।’

সন্দ্রাট কায়কাউসের কাছে নত মন্ত্রকে এলেন রুক্ষম। যুবক বীরের শৌর্যের বিবরণ শুনে সন্দ্রাট বিশ্বিত হয়ে বললেন, সে এমন কোন বীর, যে আপনার যোগ্যতাকেও বিপন্ন করেছে। মহাবীর আপনি, মোটেই বিষণ্ণ হবেন না, নিবিড় যুদ্ধে রাত্রিযাপন করুন। আপনার বিজয়ের জন্য সমস্ত রাত সৈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করব আমি।

রুক্ষম এলেন নিজের শিবিরে। বীর গোওকে পুনরায় বললেন, তুরানি যুবক বীরের কথা। বালককে দেখামাত্রই তাঁর চিত্তে যে নিদারণ দ্রুত হয়, তা-ও বললেন।

সোহরাব এল শিবিরে। তার মনেও ভীষণ অনিশ্চয়তা। কে এই অজানা মহৎ বীর, যাঁর অস্ত্রচালনা, বর্ণ-নিক্ষেপ, গদার গতি অতি দক্ষ ও সুচারু। অথচ তাঁকে কেউ চিনতে পারে না।

এই নাম-না-জানা বীরকে দেখামাত্রই তার যুদ্ধ বাসনা হারিয়ে যায় কেন? তাঁকে আঘাত করতে তার চিন্ত ব্যাকুল হয় কেন? তার বাহর রক্ত দেখে চিন্ত বিচলিত হয় কেন?

ଆଗାମୀକାଳ ପ୍ରଭାତେ ଆବାର ତାଁର ସঙ୍ଗେ ଦେଖା ହବେ । ସେ ପ୍ରଭାତ ଆର କତକାଳ ପରେ ଆସବେ? ତାଁକେ ପୁନରାୟ ଦେଖାର ଜନ୍ୟ ଯେ ଆମାର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଁ ଉଠିଛେ । ଶେନାପତି ହୁମାନ, ଆପଣି ବଲୁନ ଏ ମହାବୀର କେ? ଆମାର ମା ଯେ ବର୍ଣ୍ଣା ଦାନ କରେଛେ, ତାର ସଙ୍ଗେ ଏ ବୀରେର ଅନେକ କିଛୁ ମିଳେ ଯାଚେ । ଅର୍ଥଚ ଆପନାରା ବଲହେଲ, ମହାବୀର ରକ୍ତମ ଏ ସମରେ ଉପର୍ତ୍ତି ନେଇ । ହୁମାନ ବଲହେଲ, ‘ହୀ ତା-ଇ । ଆପଣି ଏ ନିଯେ ଆର ଚିନ୍ତା କରବେଳ ନା । ଯେ ମହାବୀରେର ସଙ୍ଗେ ଲିଙ୍ଗ ଆହେନ, ତାକେ କାଳ ପ୍ରଭାତେ ନିଧନ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପିତାର କଥା ଚିନ୍ତା କରବେଳ । ଏଥିନ ନିଃଶବ୍ଦ ମିଦ୍ରାୟ ରାତ୍ରି ଅତିବାହିତ କରିଲ । ବିଶ୍ଵାମ ଆପନାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ ।’

ସୋହରାବ ହୁମାନେର କଥା ଶୁଣେ ଶ୍ୟାତ୍ମଣ କରତେ ଗେଲ । ରାତ୍ରିର ଅବସାନ ହଲେ । ପାହାଡ଼େର ଅନ୍ତରାଳ ଥିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତମ ଆଭା ବିଷାର ଲାଭ କରିଲ । ପାଖିରା କୁଜଳ କରିଲ ।

ମହାବୀର ରକ୍ତମ ଏଲେଣ ପ୍ରାତରେ । ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାତରେ ସୋହରାବ ତଥନ୍ତି ଉପର୍ତ୍ତି ହଲନି । ରକ୍ତମେର ଚିନ୍ତ ଅକଞ୍ଚାଂ ଶୂନ୍ୟ ହେଁ ଉଠିଲ ।

ସୋହରାବ ଏଳ । ତାକେ ଦେଖେ ଆନନ୍ଦ ପେଲେନ ରକ୍ତମ । ସ୍ମୃତି ବିନିମୟ ହଲେ ଦୁଜନେର । ତରକଣ ସୋହରାବ ପ୍ରବୀଣ ରକ୍ତମକେ ବିନୀତଭାବେ ବଲିଲ, ‘ଆପନାକେ ଯା ବଲବ, ତା ଏକାନ୍ତ ଆମାର କଥା । ଆମି ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଇ ନା । ଯେ ଚାଯ, ସେ ଯୁଦ୍ଧେ ଲିଙ୍ଗ ହୋଇ, ଆମି ଆର ଆପଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନା । ଆମରା ବସେ ବସେ ଅନେକ କଥା ବଲିବ । ଜୀବନେର କଥା, ଆନନ୍ଦେର କଥା, ଶାନ୍ତିର କଥା । ପ୍ରୋଜନେ ଆମରା ପରିଚୟ ବିନିମୟ କରିବ । ଆପଣି ଜେନେ ନେବେଳ ଆମି କେ, ଆମି ଜେନେ ନେବ ଆପଣି କେ? ଗତକାଳ ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଆମାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଁବେଳେ । ଆପନାର ଦନ୍ତତା ଓ ବୀରତ୍ବର ସନ୍ଧାନ ପେଯେ ଆମାର ମନେ ବାରବାର ଦୁଷ୍ଟ ହେଁବେଳେ, ଆପଣି ଦୱାରା ମହାବୀର ରକ୍ତମ । ଆଜ ଆପନାକେ ଆମି ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଆମାକେ ବଲୁନ କେ ଆପଣି, କୋଥା ଥିକେ ଏସେହେଲ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ?’

ରକ୍ତମ ସୋହରାବେର ପ୍ରଶ୍ନେ ବିଚିଲିତ ହଲେନ । ବାରବାର ମିଥ୍ୟା ବଲତେ ହିଧା ହଲେ ତାଁର । ତିନି ବଲତେ ଉଦୟତ ହଲେନ ଆମିଇ ରକ୍ତମ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣ ଯୋକ୍ତୁ ସଂଶୋଭରେ କାଁଟାଯା ବିଜ୍ଞ ହେଁ ବଲହେଲ, ‘ଆମି ଦାଁଡ଼ାଲାମ, ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ଏମେହି ଆମି, ଯୁଦ୍ଧଇ ଆମାର କାମ୍ୟ । ଆମାର ସଙ୍ଗେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧେ ଲିଙ୍ଗ ହାତ । ନା-ହୟ ଭୀତ ଶାବକେର ମତୋ ପଲାଯନ କରେ ଲଜ୍ଜିତ ଜନନୀର କୋଲେ ଆତ୍ମଗୋପନ କର ।’

ରକ୍ତମେର ବିନ୍ଦୁପରାକ୍ରେ ସୋହରାବ ଉତ୍ସେଜିତ ହଲେ । ଭୁରିତ ପ୍ରକ୍ରିତ କରିଲ ନିଜେକେ । ଛୁଟେ ଏଳ ରକ୍ତମେର ମୁଖୋମୁଖୀ । ଶୁକ ହଲୋ ଦୁଇ ମହାନ ବୀରେର ମଧ୍ୟେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ । ଦୁଇ ପକ୍ଷେର ଦୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦୂରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଅଭ୍ୟତପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧ ଲଙ୍ଘ କରାଇଛେ । ଧୂଳା ଧୂଳାକାର ହେଁ ଗେଲ ପ୍ରାତର । ଦୁଇ ବୀରେର ଗର୍ଜନେ ଆକାଶ ମୁଖରିତ । ସର୍ମାକ୍ତ ଓ କ୍ଲାନ୍ଟ ହଲେନ ପ୍ରବୀଣ ରକ୍ତମ । ସୋହରାବ ଏକ ପ୍ରବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମହାବୀର ରକ୍ତମକେ ଭୂପାତିତ କରିଲ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁଃ ଗତିତେ ଲାଫ ଦିଯେ ତାଁର ବୁକେ ଚେପେ ବସିଲ । ସୋହରାବ କୋମର ଥିକେ ଟେନେ ନିଲ ତୀଙ୍କୁଧାର ଛୁରି । ଏଥିନ ପ୍ରବୀଣ ଓ ଦାନ୍ତିକ ବୀରେର ଶିର ବିଚିନ୍ନ କରିବେ ଦେ ।

ସୋହରାବେର ଅଧିତ ଶତିର ନିଚେ ପଡ଼େ ଆହେନ ମହାବୀର ରକ୍ତମ । ସୋହରାବେର ତୀଙ୍କ ଭୁରିର ଆବାତେ ରକ୍ତମେର ପ୍ରାଣବାୟ ଚଲେ ଯାବେ । ସୋହରାବ ତାର ଦୁଶ୍ମନକେ ହାତେର ମଧ୍ୟେ ପୋରେ ଦେଇ କରାଇ କେନ? ସାମାନ୍ୟ ଦେଇ ତୋ ତାର ଜନ୍ୟ ଆତ୍ମଧାତୀ ହତେ ପାରେ । ତବୁ ସୋହରାବ ଆରା ଏକବାର ଶତର ମୁଖ ଭାଲୋ କରେ ଦେଖେ ନିଲ ।

আর মহাবীর ক্ষমতা তাঁর অপরিমেয় অভিজ্ঞতার গুণে রক্ষা লাভের একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। কিশোর বীর সোহরাবকে বললেন, ‘ওহে তুরানি বীর, আমাকে যে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, তুমি কি যোদ্ধার প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জান না?’

সোহরাব : কী ধর্ম? শত্রুকে হত্যা করতে ধর্মের কী প্রয়োজন?

ক্ষমতা : তোমার মতো ধর্মহীন তুরানি বীর তো জানে না, ইরানি বীরের একটি ধর্ম আছে। তা হলো, সমকক্ষ বীরকে গৃহ্ণয়ের কালে হত্যা করা অন্যায়। তাকে আর একটি সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়বার পরাজিত হলেই তুমি নির্বিধায় আমাকে হত্যা করতে পার।

সোহরাব : আমি এমন ধর্মের কথা আগে শুনিনি। কিন্তু তুমি প্রবীণ যোদ্ধা, তোমার কথা অবশ্যই ঠিক।

ক্ষমতা : হাঁ ঠিক।

সোহরাব : ইরানের মহাবীর ক্ষমতা কি তোমার এই ধর্ম মেনে চলেন?

ক্ষমতা : নিশ্চয়।

সোহরাব : তাহলে তোমাকে নিঃসংকোচে মুক্তি দিলাম। এখন বিহানের জন্য চলে যাও। দ্বিতীয়বার পরাজিত হওয়ার জন্য এখানেই চলে এসো। তখন তোমার মৃত্যু ঘটবে।

সোহরাব ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। ঝোঁপ্ট ক্ষমতা জীবন ডিঙ্কা নিয়ে বীরে নদীতীরে অবসর হলেন। আজ তিনি যেমন অবসন্ন, তেমনি মন তাঁর মিথ্যাচারে জর্জরিত। এত বড়ো নিদারূণ লজ্জা তিনি দীর্ঘ জীবনে কোনোদিন পালন করেন নি।

তুরানি সেনাপতি হামান শুনলেন, সোহরাব ভূপাতিত ক্ষমতাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। তিনি অনুশোচনায় চিন্কার করে উঠলেন, ‘এ আপনি কী করেছেন সোহরাব? জানেন কি, আপনি কাকে মৃত্যু করেছেন?’

সোহরাব সচিকিৎ হয়ে বলল, ‘কে তিনি?’

হামান মুহূর্তের মধ্যে সাবধান হয়ে বললেন, ‘তিনি নিশ্চয় ইরানের একজন প্রধান বীর।’

সোহরাব হেসে উঠে বলল, ‘একজন কেন, দশজন বীরকে আমি ছেড়ে দেব। আমি ইরানে এসেছি মহাবীর ক্ষমতার সঙ্গে মিলিত হতে, আমি এখানে যুদ্ধ করতে আসিনি।’

নদীর শোতের মধ্যে নেমে ক্ষমতা বারবার শীতল পানি দিয়ে নিজের মুখ ধূয়ে নিলেন। ধূলায় ধূসরিত শরীর মার্জনা করলেন। বড়ো পিপাসার্ত তিনি। অঙ্গলি ভরে পানি তুলে বারবার পান করলেন। লজ্জায় দুঃখে তাঁর মন এখন অবসন্ন হয়ে আছে। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় সৃষ্টিকর্তা তাঁকে নিয়ে এ কী নিষ্ঠুর খেলা খেলছেন। সামান্য এক বালকের হাতে তিনি আজ পরাজিত হয়েছেন। অপরিচিত অপরিজ্ঞাত সে বালকের কী পরিচয়?

সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দুই হাত তুললেন। কাতর কষ্টে প্রভুর করুণা প্রার্থনা করলেন, ‘হে প্রভু, আমাকে শক্তি দাও, গৌরব সংরক্ষণের শৌর্য দাও আমাকে। এতকাল তুমি আমাকে গৌরবে শৰ্বস্ত্বানীয় করেছ, আজ কেন অপরাধে তুমি আমাকে শাস্তি করছ? আমার কর্ম আবেদন শ্রবণ কর মহান প্রভু।’

মহাবীর রুক্ষমের মনে হলো, যদ্যান প্রভু আস্তানে সাড়া দিয়েছেন। অমিত শক্তির উত্থান ঘটেছে তাঁর শরীরে। পুনরায় হয়েছেন তিনি অজেয়। কৃতজ্ঞতায় রুক্ষমের মন ভরে উঠল। তিনি নদীর প্রোত থেকে উঠে এলেন। এগিয়ে গেলেন যুদ্ধের নিরাশা প্রান্তরে। এবার তিনি শৌর্যে ছিল।

দিন গেল। রাত্রি এস। এল নব প্রভাত। ওই তো যুবক ধীরে ধীরে আসছে। যুবকের মুখে মনজুড়ানো সেই শিখ হাসি। যুবকের মুখমণ্ডলে প্রগাঢ় কিরণ। রুক্ষমের চিত্ত আবার ব্যাকুল হলো। তবে তা মাত্র ক্ষণিকের জন্য। শুরু হলো মন্ত্রযুক্ত। প্রথম উজ্জ্বল সূর্য দৈশ্বরের প্রতিভূ হয়ে দেখছে পিতা-পুত্রের যুদ্ধ। পুত্র যুক্ত করছে পিতার অতি সহানুভূতি ধারণ করে। আর পিতা যুদ্ধ করছেন হীয়া গৌরব সংরক্ষণের জন্য। আজ সোহরাব বড়ো অস্তির, বড়ো চম্পল তার মন। ভিল্ল চিন্তায় অন্যমনক সোহরাব অকশ্মাত পড়ে গেল মাটিতে। মহাবীর রুক্ষম তৎক্ষণাত তার বুকে বসে পড়লেন দেহের সমস্ত শক্তি নিয়ে।

সোহরাব তবু হাসছে। রুক্ষম টেনে নিলেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা। সোহরাব তবু হাসছে। রুক্ষম উদ্যত করলেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা। সোহরাব বলল, ‘ওহে বীর, এ আমার প্রথম বারের পরাজয়। দ্বিতীয়বার যুদ্ধের জন্য আমাকে যুক্ত কর। বীরের ধর্ম পালন কর।’

রুক্ষম বললেন, ‘শক্রকে করতলগত করে কোন বীর কোথায় তাকে মুক্ত করেছে হে নির্বোধ বালক?’

রুক্ষম বিলম্ব না করে তীক্ষ্ণ ছুরিকা চুকিয়ে দিলেন সোহরাবের বক্ষে। সোহরাবের হাদয় বিদীর্ঘ হয়ে গেল। আর্তনাদ করল সোহরাব।

আক্রমণকারীকে ব্যথিত কর্তে চিন্কার করে সোহরাব বলল, ‘ওরে কাপুরুষ, ইরানি বীর, তুই যা করলি, তার জন্য তোকে সমুচ্চিত শাস্তি পেতে হবে। নির্মম শাস্তি হবে তোর। যদি তুই মাছ হয়ে সাগরের বিচে পালিয়ে থাকিস, যদি বায়ু হয়ে আকাশে মিশে যাস, যদি অগ্নি হয়ে সূর্যের মধ্যে গোপন হোস, আর যদি অঙ্ককার হয়ে রাত্রির মধ্যে আশ্রয় লাভ করিস, তবু তোর নিষ্ঠার নেই।’

রুক্ষম : কেউ আমাকে স্বার্থ করতে পারবে না।

সোহরাব : নিশ্চয়ই পারবে। যখন ইরানের মহাবীর রুক্ষম শুনতে পাবেন তাঁর পুত্র সোহরাবকে তুই অন্যায় যুক্তে হত্যা করেছিস, তখন তোর নিষ্ঠার থাকবে না।

রুক্ষম : সোহরাব! রুক্ষমের পুত্র তুই? মিথ্যা কথা। না, আমার কোনো পুত্র নেই। আমার পুত্র যুক্ত করতে আসেনি।

সোহরাব : তুমি রুক্ষম! বলো, তুমই রুক্ষম। বলো—

রুক্ষম : হ্যাঁ, আমিই রুক্ষম।

সোহরাব : পিতা, আমার জন্মদাতা তুমি। আমাকে হ্লানা কোরো না পিতা, আমার শেষ বিদায় কালে আমাকে সত্য বলো, তুমি সেই রুক্ষম, আমার দ্বেষযী মাতা তহমিনাৰ স্বামী তুমি, তুমিই আমার পিতা। বলো, আবার বলো।

রুক্ষম : হ্যাঁ, আমিই, আমিই। কিন্তু আমি তো জানি—

সোহরাব : কী জান তুমি? আমার বর্ম উন্মোচন করো। আমার দক্ষিণ বাহতে তোমার স্বর্ণকবচ দেখ। মহাবীর সামের হাতের কবচ তুমি দিয়েছিলে আমার জননীকে। আমাকে পুত্র বলে আহ্বান কর, আমাকে বক্ষে ধারণ করো পিতা।

রূপ্তম : হ্যাঁ, এই তো, এই সেই স্বর্ণকবচ! আমিই দিয়েছিলাম তহমিনাকে। ওরে পুত্র, ওরে সোহরাব, এ কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল! করুণাময় মহাপ্রভু, আমি তো নিজপুত্রকে নিজহাতে হত্যা করার জন্য তোমার কাছে শক্তি প্রার্থনা করিনি।

রক্তের ধারায় সিঙ্গ সোহরাব পিতার বক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। রক্তের শ্রোতে ভেসে যাচ্ছে ধরণী। মধ্যাহ্নের সূর্য ক্রমে মান হয়ে আসছে। পিতা রূপ্তম তীব্র যত্নগ্রস্ত নিজের শরীরকে নথের আঁচড় দিয়ে ছিন্ন করছেন।

মহাবীর রূপ্তম এবং সামানগা-কন্যা তহমিনার একমাত্র সন্তান সিংহশাবক সোহরাব ঘূমিয়ে পড়ল। গাঢ় ঘূম, অনন্ত ঘূম। কার সাধ্য তাকে আর জাগায়?

লেখক-পরিচিতি

আবুল কাসিম ফেরদৌসির জন্ম ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে (কারও কারও মতে ১৯৪১ খ্রি.) ইরানের খোরাসান প্রদেশের তুস নগরে। নিরলস ৩০ বছর পরিশ্রম করে ফেরদৌসি ‘শাহনামা’ কাব্যটি রচনা করেন। এটি ইরানের জাতীয় মহাকাব্য। এ কাব্যের প্রতিটি চরণ রচনার জন্য এক দিনার করে কবি ষাট হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পাওয়ার আশা করেছিলেন। কিন্তু গজনির সুলতান মাহমুদ তাঁকে ষাট হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দেন। সম্ম-সচেতন কবি ফেন্ডে-দুঃখে সুলতান মাহমুদের গজনি ছেড়ে বাগদাদে চলে আসেন। সুলতান মাহমুদের দৃত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও তিনি আর ফিরে যাননি গজনিতে। শেষজীবনে কবি তাঁর মাতৃভূমি তুস নগরে ফিরে আসেন। গভীর মনোবেদন নিয়ে পরিগত বয়সে ১০২০ খ্রিষ্টাব্দে মহাকবি ফেরদৌসি মৃত্যুবরণ করেন।

রূপান্তরকারী লেখক-পরিচিতি

মহত্ত্বাঞ্জউদদীন আহমদের জন্ম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায়। তিনি প্রধানত নাট্যকার ও অভিনেতা। কর্মজীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে তাঁর সরকারি কলেজে শিক্ষকতায়। তাঁর? বিপুল রচনাবলির মধ্যে রয়েছে নাট্যবিষয়ক গবেষণা, মৌলিক ও রূপান্তরিত নাটক এবং বিচিত্র বিষয়ে গদ্যরচনা। তাঁর বিখ্যাত মৌলিক নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ঘাধীনতা আমার ঘাধীনতা’, ‘কি চাহ শজেচিল’, ‘সাত ঘাটের কানাকড়ি’ থভৃতি। সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি পেয়েছেন বাংলা একাডেমি, একুশে পদক ও শিশু একাডেমি পুরস্কার। ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে মহত্ত্বাঞ্জউদদীন আহমদ মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

ফেরদৌসির মহাকাব্য ‘শাহনামা’ থেকে মূলভাব অথব করে গঁজাটি লেখা হয়েছে। ইরানের পাশের শাস্তিত্বিয় দেশ সামনগার রাজকণ্যা তহমিনাকে বিয়ে করেন মহাবীর রূপ্তম। বিয়ের অল্পকালের মধ্যে রূপ্তম তাঁর রাজ্য ইরানে ফিরে যান। তহমিনার গর্ভে জন্ম নেয় রূপ্তমের সন্তান বীর সোহরাব। হলে জন্মানোর সংবাদ পেলে রূপ্তম সন্তানকে তাঁর মতোই যুদ্ধে নিয়ে যাবে— এ ভয়ে মা তহমিনা আমী রূপ্তমকে খবর পাঠান একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। এ থেকেই মূল বেদনা-গাথার শুরু। ‘যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাপুত্র’ মহাবীর রূপ্তম কীভাবে পুত্র সোহরাবকে হত্যা করল সেই বেদনামাখা কাহিনি। এখানে দেখা যায়, হলে সোহরাব পিতার খৌজে এসেছে ইরান, কিন্তু কেউই রূপ্তমের সকান দিতে পারছে না। অথচ নিজেরই অভাবে তরবারি ধরতে হলো পিতার বিরুদ্ধে এবং মৃত্যুও হলো তার। মৃত্যুর সময় দুজন জানতে পারল যে, সম্পর্কে তাঁরা আসলে পিতা ও পুত্র। মহাবীর রূপ্তম অচেনা তুরানি বালকের কাছে পরাজিত না হওয়ার জন্য বীরত্বকে বিসর্জন দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। নিজের হাতে ছুরিবিদ্ধ করে আপন সন্তানের বুক। পরিচয় পাওয়ার পর জীবনে নেমে আসে হাহ্যকার।

জয় বা বীরত্ব কাঞ্চিত ও প্রশংসনীয়। কিন্তু বীরত্বের নামে প্রতারণা জীবনে বয়ে আনতে পারে চরম মানবীয় বিপর্যয়— যা এ গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

নিধন	— হত্যা।
মাতৃল	— মামা।
নির্বাপিত	— নিবে গিয়েছে এমন।
দুর্গ	— সৈন্য থাকার স্থান।
চূর্ণ-বিচূর্ণ	— গুঁড়া গুঁড়া হওয়া।
কূটকৌশল	— চতুর কৌশল।
নিয়তির লীলা	— ভাগ্যের খেলা।
বিমুক্ত	— বিশেষভাবে মুক্ত।
দুর্বল	— অশক্ত, ভীষণ।
বীরোচ্নম	— বীরদের মধ্যে উত্তম।
মহাত্ম	— সবচেয়ে মহৎ।
সংকটকাল	— বিপদের সময়।
শিরত্রাণ	— যুদ্ধে মাথায় পরার বর্ম বিশেষ।
দন্ত	— অহংকার।
নিষ্পন্ন	— চলে যাওয়া।
অলীক	— মিথ্যা, অপার্থিব।
পদার্পণ	— পা রাখা, আসা।

অনুশাসন	— আইন, প্রথা।
দুর্বলীয়	— যা সহজে দমন করা যায় না।
শৈর্ঘ	— বীরত্ব, সাহস।
ক্রেতাঙ্ক	— ক্রোধে অক্ষ।
শিবির	— তাঁবু। সেনা-নিরাস।
বিপন্ন	— বিপদ্ধাঙ্গ।
মন্ত্রযুদ্ধ	— কৃতি, অক্ষ ছাড়া যে যুদ্ধ।
তীক্ষ্ণধার	— ঝুব ধারাল।
অমিত	— অগরিমিত, প্রচুর।
অপরিমেয়	— অসংখ্য, পরিমাণ করা যায় না এমন।
জজরিত	— নিপীড়িত, জীর্ণ।
অনুশোচনা	— পরিতাপ, খেদ।
ক্রতৃপক্ষ	— নাগালের মধ্যে। মুঠোর ভেতরে।
স্বর্ণকবচ	— সোনা দিয়ে বানানো মাদুলি বা তাবিজ।

নাটিকা
জাগো সুন্দর
কাজী নজরুল ইসলাম



প্রথম অঙ্ক

- কঙ্কণ : ওঁকার ! ওঁকার ! খেলতে খেলতে আমরা এ কোথায় এসে পড়েছি ? কে আমাদের এখানে আনলে ?
- কল্পনা : আমি— তোমাদের নিদি কল্পনা । কঙ্কণ, ভালো করে চেয়ে দেখো দেখি, আমাকে চিনতে পাবো কি না ।
- কঙ্কণ : না— হ্যা, তোমার যেন কোথায় দেখেছি, অথচ ঠিক মনে করতে পারছিলে ।
- কল্পনা : আচ্ছা, আমি মনে করিয়ে দিই । কাল রাত্রে ছাদে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে চুপ করে কী ভাবছিলে, মনে পড়ে ?
- কঙ্কণ : হ্যা, মনে পড়েছে । ভাবছিলাম, আমি যদি ওই চাঁদের দেশে এক নিমেষে উড়ে যেতে পারতুম, তাহলে কী মজাই না হতো । তারপর মনে হলো আমার মনের ভিতর কে যেন এক ডানাওয়ালা সুন্দরী পরি আছে, সে যেন জানু জানে, সে যেন এক নিমেষে আমার ঘেৰালৈ ইচ্ছা সেখানে লিয়ে যেতে পাবে ।
- কল্পনা : ঠিক ধরেছ ! এখন চেয়ে দেখো দেখি, আমি সেই পরির মতো কিনা !
- কঙ্কণ : আরে, ঠিক সেই তো ! একেবারে ছবছ মিল ! আমার মনের সেই পরি তুমি ! তোমার নাম কী বললে ?
- কল্পনা : আমার নাম কল্পনা । আমায় কল্পনাদি বলে ডেকো !

- কঙ্কণ : ধ্যাং, তুমি যে আমারই মতো বড়ো। তোমাকে—আচ্ছা দিদি বললে বদি সুখী হও, তা+ই বলব। কিন্তু—
 কল্পনা : বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তুমি যেখানে যেতে চাইবে আমি সেইখানেই নিয়ে যাব। এখন চলো
 সাগর জলের তলে। (সাগরের শব্দ ভেসে এল)
- কামাল : এই কঙ্কণ! পালিয়ে আয়! ও জানু জানে, পরির বাঢ়া, উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এই যাহ! তোর মাদুলিটা
 ফেলে এসেছিস বুঝি? দেখি আমার তাবিজটা আছে কি না। অ্যাঁ, আমার তাবিজটা—কে নিলে?
- কল্পনা : এখন আর কোনো বীজেই কিছু ফল হবে না কামাল! আমি তোমাদের ফুলের রথে করে সমুদ্র-জলে
 নামতে শুরু করেছি! ও কী, ওঁকার অমন চোখ বুজে আছ কেন?
- ওঁকার : ভয় পেলে আমি চোখ বুজে বসে থাকি। কিংবা প্রাণপণে চেঁচিয়ে গান করি।
- কল্পনা : এই চোখ বোজা কার কাছে শিখলো?
- ওঁকার : ভেড়ার কাছে।
- কল্পনা : ভেড়ার কাছে?
- ওঁকার : হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ে দেখেছিলুম, একপাল ভেড়ার মানে একটা নেকড়ে বাঘ এসে পড়ল। যেই নেকড়ে
 বাঘ দেখা আর অমনি পালের সব ভেড়া গোল হয়ে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল।
- কল্পনা : আর তাই দেখে বুবি নেকড়ে বাঘ পালিয়ে গেল!
- ওঁকার : দূর! তা হবে কেন? নেকড়ে বাঘ ভেড়াদের এক-একটার কান ধরে ঘাড় মটকে রেখে আসে, এনে
 আবার একটার কান ধরে নিয়ে যায়!
- চাকাম ফুসফুস : ওরে ক্বাবারে! গেছি রে গেছি রে, একেবারে মরে গেছি রে মা! (সমস্ত 'স'-এর উচ্চারণ দণ্ড
 'স' দিয়ে) আজ সকালে সাঙ্গকের শৃশান ঘাটে সিনান করতে গিয়ে এই সর্বনাশটা হলো।
 শৃশানের শ্যাঙ্গড়া গাছের শাকচুরিতে ধরেছে রে বাবা!
- কল্পনা : ও কে চিন্কার করে অমন করে? কে ওই ভীরু?
- কঙ্কণ : ওর নাম ন্যাড়া, আমরা ওর নাম রেখেছি চাকাম-ফুসফুস! ও বড়ো ভীতু কিনা! একটু ভয়ের কথা
 শুনলেই ওর ফুসফুস চুপসে গিয়ে বুকে গর্ত হয়ে যাব।
- কামাল : আর মুখ শুকিয়ে গিয়ে চাকাম চুকুম শব্দ করতে থাকে— তাই ওঁকার ওর নাম রেখেছে চাকাম
 ফুসফুস। [সমুদ্রের শব্দ]
- ওঁকার : উহু কী ভীষণ গর্জন!
- কামাল : কী ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস! আমার গা শিরশির করছে!
- চাকাম ফুসফুস : আমার দাঁতে দাঁত লাগছে। শৃশান দেখে কী সর্বনাশটাই হলো! হি হি হি! [দাঁতে দাঁত
 লাগার শব্দ]
- কঙ্কণ : আমার কিন্তু চমৎকার লাগছে কল্পনাদি, কিন্তু অত অন্ধকার কেন? সমুদ্রে কি আলো নেই?
- কল্পনা : সাগর-জলের নিচে মণিমুক্তার আলো। আর দেরি নেই, ওই আমরা এসে পড়েছি— সাগরজলের
 পাতালতলে! খোলো দুয়ার।
 [হঠাত যন্ত্রসংগীত ও সাগর-গর্জন বন্ধ হয়ে গেল]

কঙ্কণ : [হাততালি দিয়ে] কল্পনাদি, দেখো দেখো কী সুন্দর আলো! কত হীরা মানিক মুঝে! কামাল!

ওংকার :

কামাল : এই কঙ্কণ, খবরদার, ওসব হীরা মানিক ছুঁসনে! আমাদের গাঁয়ে একজন পুঁথি পড়ছিল, তাতে শেখা আছে— ওসব পরিদের হিকমত। ছুঁলেই পাথর হয়ে যাবি!

ওংকার : হাফপ্যাটের পকেট তো ভরতি হয়ে গেল হীরা মানিকে। আর নিই কোথায়? বাবাকে কতবার বললাম যে, হাফপ্যাটের দুটো বুক পকেট করে দাও, তা বাবা শুনলেন না। গাঁয়ের জামাটাও ভুলে রেখে এলুম।

চাকাম ফুসকুস : ওরে বাপ রে! কী সর্বনাশটাই হলো। এ যে খই-মুড়ির মতো হীরা ছড়ানো রয়েছে। নিলে শ্যাওড়া গাছের ওই শাকচুম্পিটা ধরবে না তো?

কল্পনা : শোনো কঙ্কণ, ওংকার, কামাল! তোমরা বড়ো হয়ে আসবে এই সাগর-জয়ে। এই সাগরকে যে বীর জয় করবে— সে-ই পাবে এই সাগরের হীরা মানিক মুঝে। এই পাঞ্চজন্য শঙ্খে বেজে উঠবে তারই শুভ আগমনী বার্তা! কামাল তৃষ্ণি কী হবে?

কামাল :

আমি সাগর পাড়ি দেব, হব সওদাগর!
সাত সাগরে ভাসবে আমার সগ্ন মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে।
ময়ূরপঞ্জি বজায় আমার শাল রঞ্জ পাল তুলে
চেউ-এর দোলায় হাঁসের মতন চলবে হেলে দুলে।

কল্পনা : আর কঙ্কণ?

কঙ্কণ : সগ্ন সাগর রাজ্য আমার, হব সিঙ্গুপতি;
আমার রাজ্য কর জোগাবে রেবা ইরাবতী।
কত সিঙ্গু ভাগীরথী॥
[সাগর-জলের শব্দ! পুক্ষরথ ধেন সাগর হতে উঠে অন্যত্র চলে গেল।]

দ্বিতীয় অন্ত

[ভোর হয়ে এল। পাথির কলরব ভেসে আসছে]

বেণু : কঙ্কণদা, ওংকারদা! চোখ খোলো, আমরা সমুদ্রের থেকে উঠে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। ওই দেখো,

সুয়িং উঠছে।

ওংকার : বায়কোপের সুয়ি নয় তো! কল্পনাদির মাঝায় সব ভুল দেখছি মনে হচ্ছে।

কল্পনা : খুকি, তৃষ্ণি কোথাকে এলে? তোমার নাম কী?

বেণু : আমার নাম বেণু। আমি কোথাও থেকে আসিনি, এইখানেই লেপ মুড়ি দিয়ে শয়েছিলুম। সব শনেছি

সব দেখেছি। ভয়ে কথাটি কইনি!

কল্পনা : তা বেশ, আমরা এখন চাঁদের দেশে, মঙ্গলগ্রহে যাবে। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

বেণু : [ভয় পেয়ে] না! আমাকে পুরুরের কাছে নাহিয়ে দাও, আমি এক ছুটে বাড়ি পালাব!

ওংকার : তোর আঁচলে কী রে বেণু? অ! আমার হফগ্যান্টের পকেট থেকে সব মুক্তো মানিক চুরি করেছিস বুঝি?
দে, দে আমার মুক্তো দে।

বেণু : বা রে, তোমার ছেঁড়া পকেট গলে ওগুলো আপনা থেকে আমার কাছে এসেছে। আমি চুরি করব কেন?
আচ্ছা, ওংকারদা, তোমরা হলে, তোমরা ও নিয়ে কী করবে? এখন ওগুলো আমার কাছে থাক,
তোমার বউ এলে মালা গৈথে উপহার দেব।

চাকাম-কুসফুস : [কল্পনাকে উদ্দেশ্য করে] কাল-ফণী দিদি! ওই শ্যামবাজারের দোতলা বাস যাচ্ছে— ওর ছাদে
আমায় টুপ করে ফেলে দাও না। আমি সী করে সোজা সরে পড়ি! কী সর্বনাশটাই হলো আমার।

কল্পনা : তোমার ভয় দূর না-হওয়া পর্যন্ত এমনি ভয় দেখিয়ে নিয়ে বেড়াব তোমায়। ভয়ের মাঝে রেখেই
তোমার ভয় দূর করব। আচ্ছা বেণু, তোমার কী ভালো লাগে? চাঁদের দেশ, না মাটির পৃথিবী?

বেণু : মাটির পৃথিবী। আমি এই পৃথিবীকে খুব ভালোবাসি। একে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। ও
যেন আমার মা।

কল্পনা : আচ্ছা, এই পৃথিবীতে তোমার কী হতে ইচ্ছা করে?

বেণু : আমার ইচ্ছা করে—

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুমবাগে উঠব আমি ডাকি।
সুখ্যামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
'হয়নি সকাল, ঘুমো এখন' মা বলবেন রেগে।
বলব আমি, 'আলসে মেরে, ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল তাই বলে কি সকাল হবে নাকো?
আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার মেরে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে!'

ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহনায়
বলব আমি, 'ভোর হলো যে, সাগর ছুটে আয়।'
ঝরনা-মাপি বলবে হাসি, 'খুকি এলি নকি?'
বলব আমি, 'নইকো খুকি, ঘুম-জাগান্তে পাখি।'

ওংকার : কল্পনাদি, মঙ্গল গ্রহ না চাঁদের দেশে যাবে বলছিলে না? সমুদ্রের জলে ভিজে আমার ভীষণ সর্দি
ধরেছে— তাই বলছিলুম যা যুক্ত লেগেছে কল্পনাদি, তাতে বুঁৰো দেখলুম, আমার রাজা টাজা হওয়া
পোষাবে না। ও বাক্সির চেয়ে অনেক ভালো—

আমি হব গাঁয়ের রাখাল ছেলে।

বলব, 'দাদা, প্রগাম তোমায়, ঘূম ভাঙিয়ে গেলে।'
 আঁচল ভরে ঝুঁড়ি নেব, হাতে নেব বেশু,
 নদীর পারে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু।
 বাহুরাটিরে কোলে করে পাই হব বিল-খাল,
 বটের ছায়ায় জুটিবে এসে রাখাল ছেলের পাল।

- কঙ্কণ : কঞ্চনাদি, তোমার রথ থামিয়ো না। চলো হিমালয়ের গৌরীশংকরের চূড়ায়, উভর মেরুর বরফ পেরিয়ে
 নাম না-জানা দেশে। চলো চাঁদের বুকে, মঙ্গলগ্রাহে।
- কঙ্কণা : তোমায় নিয়ে যাব কঙ্কণ, অসীমের সীমা খুঁজতে— অকূলের কূল দেখাতে। তার আগে তোমার পৃথিবীর
 কাজ সেরে নিতে হবে। ধরো, পৃথিবীতে যদি তোমায় কাজ করতে হয়, তুমি কী করবে?
- কঙ্কণ : আমি গাইব গান—আর সারা পৃথিবীর মানুষ ধরবে তার ধূয়া।

(গান)

চলু চলু চলু

উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...

- কঙ্কণা : শুধু গান গাইবে? কর্ম করবে না?

- কঙ্কণ : কর্মই তো আমার ধাগ। কাজ করি বলেই তো রাত পোহায়।

আমি হব দিনের সহচর—

বলব, 'ওরে গোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে কর!

তোদের ছেলে উঠল জেগে, ওই বাজে তার বাঁশি,
 জাগল দুলাল বনের রাখাল, ওঠ রে মাঠের চাষি।'
 'শ্যাওলা' 'হাঁসা' দুই না বলদ দুই ধারেতে জুড়ে
 লাঙলের ওই কলম দিয়ে মাটির কাগজ খুঁড়ে
 সিথব সবুজ-কাষ্য আমি, আমি মাঠের কবি—
 ওপর হতে করবে আশিস দীপ্ত রাঙা রবি।
 খামার ভরে রাখব ফসল, গোলায় ভরে ধান,
 কুধায় কাতর ভাইগুলিকে আমি দেব প্রাণ।
 এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখব চিরতাজা,
 আমি হব কুধার মালিক, আমি মাটির রাজা॥

[হঠাৎ সকলে 'ধর ধর গেল' বলে চিৎকার করে উঠল। ঢাকাম-ফুসফুসের, 'কী সর্বনাশটাই হলো রে বাবা' বলে
 চিৎকার শোনা গেল।]

ওঁকার : কঞ্চনাদি, কঞ্চনাদি, ধরো ধরো, ঢাকাম-ফুসফুস পুকুর জলে বাঁপিয়ে পড়ছে।

কল্পনা : [হেসে] ভয় নেই, ও জল থেকে সাঁতরে ডাঙায় উঠে বাড়ির দিকে দৌড় দেবে! তবে দৌড়ে পালাবে কোথায়? আবার আমার কাছে ধরা দিতেই হবে! ও কি বেগু? কাঁদছ? ওগুলো মুক্তো মানিক নয়।

তোমরা শুধু বিনুক কুড়িয়ে এনেছে। যেদিন তোমার দাদারা সত্যিকার সাগর জয় করে আসবে আবার তোমরা মেয়েরা তাদের সাহায্য করবে ওই সাগর অভিযানে— সেই দিন সত্যিকারের মুক্তো মানিক পাবে। —তার আগে নয়।

কঙ্কণ : শুদ্ধের নামিয়ে দিয়ে আমায় নিয়ে চলো না কল্পনাদি চাঁদের দেশে। সেখান থেকে পৃথিবীতে আনব— অমৃত, জরা মৃত্যু থাকবে না— থাকবে শুধু সুন্দর চির-কিশোর।

[রাখের দূরে যাওয়ার শব্দ]

(গৃহকর্মীর প্রবেশ)

গৃহকর্মী : হেই খোকাবাবু উঠো উঠো। সারা রাত্তির কি ছাদে শয়ে থাকবে? ঠাণ্ডা লাগিব যে! উঠো! উঠো!

গৃহকর্মী : কঙ্কণদাকে উঠিয়ো না— ও এখন ‘রকেট’ করে চাঁদের দেশে গিয়ে জ্যোৎস্নার আরক খাচ্ছে। আমি ততক্ষণ ওর পকেটের কমলালেবুটা খেয়ে ফেলি!

[যবনিকা]

লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল দুখু মিয়া। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংরেজ সেনাবাহিনির বাঙালি পল্টনে যোগ দেন। এ সময়ই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর রচনায় সামাজিক অবিচার এবং পরাধীনতার বিকলে তীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। এজন্য তাঁকে ‘বিদ্রোহী কবি’ বলা হয়। তাঁর রচিত কাব্য— ‘অশ্ব-বীণা’, ‘দোলন-চাঁপা’, ‘বিবের বাঁশি’ ইত্যাদি। গল্পছন্দ— ‘ব্যাথার দান’, ‘রিক্তের বেদন’, ‘শিউলি-মালা’। উপন্যাস— ‘বাধন-হারা’, ‘মৃত্যুকুধা’, ‘কুহেলিকা’। নাটক— ‘বিলিমিলি’, ‘আলেয়া’, ‘শিঙ্গা’, ‘মধুমালা’ প্রভৃতি। প্রবন্ধ— ‘রাজবন্দীর জ্বানবন্দী’, ‘যুগবাণী’, ‘দুর্দিনের যাত্রী’। কবি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় শেষবিনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

কল্পনাশক্তি মানুষের অমূল্য সম্পদ। এ নাটিকায় কিশোর কন্ধনের দল ষপ্ট-কল্পনায় এক পরির সহযোগিতায় চলে যায় সাগরতলের আজানা দেশে। তারা রাকেটে চেপে যেতে চায় চাঁদের দেশে ও মঙ্গলহচ্ছে। তারা হতে চায় সওদাগর, বিজ্ঞানী কিংবা গ্রামের রাখাল ছেলে। ষপ্টে পরির রথে চড়ে তারা ঘুরে এসেছে কল্পনার বহু দেশ থেকে। একপর্যায়ে সকালবেলায় তাদের গৃহকর্মী এসে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তারা বাস্তবে ফিরে আসে। তখন বোঝা যায় কিশোরের দলটি ঘরের ছাদে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

নাটিকাটিতে কৌতুকপূর্ণ সংলাগ ও দৃশ্যের মাধ্যমে মানুষের ষপ্ট-কল্পনার ছবি প্রকাশিত হয়েছে। মজার বিষয় হলো— কাজী নজরুল ইসলাম যখন এ— নাটিকা রচনা করেন, তখনও চাঁদের দেশে মানুষের পা পড়েনি।

শব্দার্থ ও টাকা

মাদুলি	— ধাতুর তৈরি ছোটো চোপের মতো কবচ।
রথ	— চাকাযুক্ত অথবা চাকাহীন একধরনের কাল্পনিক বাহন।
শূশান	— যে ছানে মৃতদেহ দাহ করা হয়।
সিনান	— শান।
রঞ্জিতীন্দ	— কঞ্চিত পেঁতী।
মণি	— দামি গাথর, যা গহনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
মুজ্জা	— রত্নপাথর। মুজ্জা বিনুকের মধ্যে তৈরি হয়।
পৃথি	— হাতে খেঁধা পুরনো বই বা পাত্রলিপি।
হিকমত	— কৌশল, কায়দা, চাতুর্য।
বুক পকেট	— বুক বরাবর জামার পকেট।
শ্যাঙ্গড়া গাছ	
(শ্যাঙ্গড়া)	— এক ধরনের জংলা গাছ।
পাঞ্চজন্য	— শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম।
সওদাগর	— বড়ো ব্যবসায়ী।
মধুকর	— মৌখাছি, ভ্রমর।
বিশ্বজোড়া	— পৃথিবীজুড়ে।
ময়ূরপঙ্কী	— ময়ূর আকৃতির সৌকা।
বজরা	— একপ্রকার বড়ো নৌকা।
সিঙ্গুপতি	— সাগরের রাজা।
রেবা	— প্রাচীন ভারতের একটি নদী। বর্তমান নাম নর্মদা।
ইয়াবতী	— পাঞ্চাব অঞ্চলের নদী।
সিঙ্গু	— বিখ্যাত নদী। এ নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা— যা সিঙ্গুসভ্যতা নামে পরিচিত।
ভাগীরথী	— ভারতের একটি নদী।
পুষ্পরথ	— মূল দিঘে সাজানো রথ।
বায়কোপ	— চলাচিত্র, সিলেমা।
মঙ্গল গ্রহ	— সৌরজগতের একটি গ্রহ।
দোতলা বাস	— দুই তল বা স্তর বিশিষ্ট বাস।
বেণু	— বাঁশি।
ধেনু	— গাভী।

গৌরীশংকর	— হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।
উত্তর মরু	— পৃথিবীর সর্ব-উত্তরের বরফ আচ্ছাদিত প্রান্ত।
মাদল	— একধরনের বাদ্যযন্ত্র।
অশিস	— আশীর্বাদ।
দীঞ্চ	— উজ্জ্বল।
রবি	— সূর্য। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বোঝানো হয়েছে।
খামার	— মাঠ থেকে শস্য এনে রাখার এবং ঝাড়াই-মাড়াই করার জায়গা।
গোলা	— ধান রাখার জায়গা।
রকেট	— মহাকাশযান। ইংরেজি Rocket.
আরক	— নির্বাস বা সারবন্ধ।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম-আনন্দপাঠ

প্রাম্ণ মানসিক শক্তি বাড়ায়।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।